শতাব্দীর স্বপ্ন

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

শতাব্দীর স্বপ্ন

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

প্রকাশক
র‍্যাডিক্যাল ইনষ্টিট্যুট
গৌহাটী
১৯৪০

আগুন

তখন আমরা মেটিয়াবুরুজ মিল-এলাকার ধারে একটা ছোট বাড়ীতে থাকতাম। বাড়ী মানে অবশ্য ছোট্ট একটা খোলার ঘর, তার চেয়েও ছোট একখানা রান্না-ঘর এবং তদনুযায়ী একটা উঠোন।

ঘরের একটী মাত্র জানালা, তারই ধারে বসে আমি রোজকার পড়া তৈরী করতাম। সামনে একটা সরু কাদা-ওঠা রাস্তা অনেকবার এঁকে বেঁকে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেচে। মোড়ে একটা মাত্র জলের কল, তা দিয়েই আশে পাশের প্রায় একশ পরিবারকে জলের অভাব মেটাতে হত।

সকাল সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত নানা রকম লোক নানা রকম কাজে আমার এই ছোট জানালার সামনে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে যেত। কিছুদিন পরে পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পারতাম যে এবার নিশ্চয় টাক-মাথা কোট-পরা ছাতা-হাতে সেই মোটা ভদ্রলোকটী তার মোটা জুতোর শব্দ করতে করতে হাজির হবেন। এর পর আসবে সেই জুতো সেলাই, তারপর আবার সেই লম্বা নাক-ওলা ভদ্রলোক। কল্পনায় তাদের প্রত্যেককে একটা বিশেষ কাজে নিযুক্ত বলে ধরে নিতে কোন বাধা ছিলনা। টাক-মাথায় ভদ্র-লোকটী নিশ্চয় কোন সওদাগরী অফিসের কেরাণী, নাক উঁচু ভদ্র-লোককে ভাবতাম ব্যবসাদার, —এমনি।

আর একজন লোককে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরতাম। সবুজ ও সাদা চেক-কাটা লুঙ্গীর সঙ্গে একটা পুরোণো ছেঁড়া চাইনিজ সিল্কের পাঞ্জাবী-পরা অবস্থাতেই তাকে সব সময় দেখতাম। তার পোষাক থেকেই আন্দাজ কোরেছিলাম যে সে মুসলমান। প্রত্যেক দিন যাবার আসবার সময় সে তার বড় বড় লাল চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে একবার তাকাত। প্রথম প্রথম কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ কোরতাম। আস্তে আস্তে তার সেই দৃষ্টিটা আমার সয়ে এলো।

কিছুদিন পরে ভুলেই গিয়েছিলাম যে তার চোখে কোন বিশেষত্ব আছে। মাঝে মাঝে সে আমার বি-টাইমপিস ঘড়িটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস কোরত, "কেতনা বাজা হ্যায় বাবু ?" উত্তরে রোজই প্রায় আমাকে বলতে হত, "আট বাজনেকো দশ-মিনিট।" যদিবা কোন দিন আর একটু বেশী বেজেছে শুনতো, অমনি সে তার ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করতো।

আস্তে আস্তে লোকটার সঙ্গে আর একটু বেশী পরিচয় হল। একদিন বিকেল বেলা আমার ছোট বোনটির সঙ্গে রাস্তার কল থেকে জল আনতে গিয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়েছিলাম। দূর থেকে লক্ষ্য কোরলাম, সে তার মত আরও কয়েকটী দিন-মজুরের সঙ্গে কি সব বলে হল্লা করতে করতে ফিরে আসচে। অন্য লোকগুলি গলির মোড় পর্য্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরবার সময় বলে গেল, "মাথা ঠাণ্ডা করকে আউর দুচার রোজ রহো ত, ফিন্ তোমকো রুপেয়া নেহি মিলেতো হাম লোক্ ভি হ্যায়।"

লোকটা হিন্দুস্থানীতে কি একটা শপথ কোরে উত্তর দিল,—"ও শালেকো হাম খুন কর ডালেগা"।

সঙ্গীরা অল্প দূর গিয়ে আবার ফিরলো, তার কাঁধে হাত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো "আউর দু'তিন রোজ ত ঠারনেই চাহি, নবি, মালিক রুপেয়া দে, তব ত ম্যানেজার তোমকো দেনে সেকতা"। "নেহি, নেহি" বলে উত্তরে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সে আর কি সব বললো, ঠিক শুনতে পেলাম না। বুঝলাম ওর নাম নবী, সঙ্গীরা চলে গেলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "কি হয়েছে নবী, কাকে খুন কোরছো ?"

সে দেখলাম বাংলা খুব ভালই বোঝে, অল্প ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিল, "হামকো ম্যানেজার শালেকো, খোকা বাবু।"

"হঠাৎ তোমার ম্যানেজার এমন কি করলো যে তাকে একেবারে খুনই করতে হবে ?"

নবী জানালো তার ছেলের খুব অসুখ, এদিকে ম্যানেজার তার তিন দিনের কামাইয়ের জন্য তার মাত্র বার টাকা মাইনে থেকে তিন টাকা কেটে রেখেছে। গত মাসের ধার শোধ করতে গেছে তিন টাকা, আর নতুন মাস পড়তে পড়তেই তার বাড়ীওয়ালা নিয়ে গেছে চার টাকা; এখন বাকী মাত্র দুটি টাকা দিয়ে এই সমস্ত মাসটা নিজেই বা খাবে কি বা রোগীকেই বা খাওয়াবে কি!

নবীর দুঃখ কতকটা বুঝলাম, কিন্তু আমারই সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমারই পরিচিত লোকের দ্বারা একটা খুন হয়ে যাবে, এ কল্পনাটাও আমার কাছে বড় অপ্রীতিকর মনে হল। সুতরাং আমার যথা সাধ্য আমি নবীকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি তাকে বইয়ে পড়া উপদেশগুলি বেছে বেছে শোনালাম যে খুন করা মহাপাপ, ভগবানের রাজ্যে অন্যায় করলে নরকে যেতে হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু ভগবানের প্রতি তার খুব আস্থা আছে বলে মনে হল না, আমার এত কথার উত্তরে সে শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে নিজের মনেই মাথা নাড়তে নাড়তে বাড়ীর দিকে রওনা হল। ফিরবার পথে বোন জিজ্ঞেস কোরলো "ওকি সত্যিই খুন করবে নাকি দাদা ?"

"আমি কি করে জানব ?"

"ও সব পারে, দেখনা তাড়ি খেতে খেতে চোখ দুটো কি ভীষণ হয়েছে।"

"তুই তো সব জানিস্,—ও তাড়ি খায় কে বলেছে তোকে ?"

"জানি জানি, আমাদের ধোপার চোখ দুটোও ঠিক এই রকম, ধোবানী বলেছে, তাড়ি খেলে অমন হয়।"

সেদিন সন্ধ্যে বেলা থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রান্না ঘরের চাল দিয়ে জল পড়তে থাকায় আমরা শোবার ঘরেই খেতে বসেছি। বাবা সঙ্গে বসায় সবাই চুপ্ চাপ, এমন সময় একটা ভাঙ্গা ছাতা মাথায় কোত্থেকে নবী এসে হাজির, তার বিরস মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ছেলে কেমন আছে নবী ?"

সে জানাল যে ছেলের জন্যই তাকে এই বৃষ্টি মাথায় কোরে বেরোতে হয়েছে। তারপর আমাদের ভাতের থালার দিকে চেয়ে একান্ত সরলভাবে বলে ফেলল, "নেহি, হাম দুসরি কোইকো পাস যাতা হ্যায়"।

তার হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কিছু চাইতে এসেছিল, কিন্তু আমাদের দৈন্যের দৃশ্য তাকে নিরুৎসাহ কোরেছে। তবু আমি তাকে খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কোরলাম, "তোমার কিছু পয়সা চাই নবী ?"

দেখলাম সে ভিক্ষে চাইতে অভ্যস্ত নয়, বল্ল,

"হাঁ হুজুর, মগর জাস্তি নেহি। হামকো লেরকাকো লিয়ে একঠো হোমিওপ্যাথ দাওয়াই মুলানেকো ওয়াস্তে হাম ছয়ঠো পয়সা মাঙ্গতা, ও মাহিনামে হাম ঠিক দে দেঙ্গে।"

আমরা খুব আস্তে কথা বললেও বাবা দেখলাম সবই শুনতে পাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "ছ'টা পয়সা বোধহয় আমি ওকে দিতে পারব, খেয়ে উঠে বালিসের তলা থেকে দিয়ে দিস্।"

পয়সা হাতে পেয়ে সে বললো, "আপলোককো বহুৎ মেহেরবাণী হুজুর !"

আমি হেসে বললাম, "কখন আবার খুন টুন করে ফেলবে তাই দিচ্ছি।"

নবী ভয়ানক ভাবে প্রতিবাদ কোরল, "হাম কভি খুন নেহি করতা।"

"সেদিন যে ম্যানেজারকে খুন করবে বলছিলে ?"

"উস্‌কো হাম খুন নেহি করেগা।"

"তবে ?"

"উস্‌কো মিলপর হাম আগ লাগায় দেগা।"

"অনেক ভেবে বুঝি তুমি তাই ঠিক করেছ ?"

সাধারণতঃ সে আমার সঙ্গে বেশ নম্র-ভাবেই কথা বলে, আমার এ কথায় যে তার কি হল, হঠাৎ ভয়ানক রকম জ্বলে উঠলো,

"আগ্‌ কেয়া এক রোজমে জ্বলতা হায় হুজুর, উল্টাডাঙ্গা পর হাম একঠো ম্যাচ ফ্যক্টরীমে দেখা থা একঠো শলাইকো কাঠি জ্বালানেকো আগারী কেতনা মেহনৎ করনে হোতা,"—তারপর কেন সুইডেন থেকে কাঠ আনতে হয়, বারুদ তৈরী কোরবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের কিরকম পরিশ্রম করতে হয়, বড় বড় গাছের গুড়ি গুলিকে ছোট সরু সরু দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত করা কত শক্ত ব্যাপার, তা সে আমাকে বিশদ ভাবে বোঝাতে লাগল। আমি এত খবর কোন দিনই রাখতাম না, শুনতে আমার বেশ উৎসাহ-ই বোধ হচ্ছিল; তবে দিয়াশলাইর কাঠি তৈরী করবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রীয়ার সঙ্গে মিলে আগুন লাগিয়ে দেবার সঙ্কল্পের কি সম্বন্ধ ঠিক বুজে উঠতে না পেরে তাকে প্রশ্ন কোরলাম।

নবী মাথা নেড়ে জবাব দিল,—"ওহি ত বোলতা হায় হুজুর।"

তারপর এক নিশ্বাসে সে তার সমস্ত জীবনের দুঃখের কথা বলে গেল :—

সে বেহারী মুসলমান। ২৮ বছর আগে তার এক বন্ধু তাকে কোলকাতা দেখাবার ছল কোরে আসামের এক চা বাগানের কুলীগিরিতে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসে। সেখানে অনেক বছর অশেষ দুঃখ ভোগের

পর কোন রকমে সে মুক্তি পেয়ে কোলকাতায় এসে সে এই মিলে চাকরি জোটালো। তারপর সে বিয়ে করল, মাকে আনলো দেশ থেকে, ভাবলো খোদা বুঝি তার দিকে এবার মুখ তুলে চাইলেন।

কয়েক বছর স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তার বেশ সুখেই কেটেছিল, কতকগুলি পুঞ্জীভূত অসন্তোষের শেষ ফল স্বরূপ হঠাৎ তাদের মিলে হল ষ্ট্রাইক। উদ্যোক্তাদের মধ্যে তার নাম থাকাতে ম্যানেজার তাকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে বরখাস্ত করলেন। সামান্য কয়টা জমান টাকা ফুরিয়ে যেতে বেশী দিন লাগল না, এবং শেষে ঘটি-বাটী বিক্রী করে আরও কয়েকদিন চলেছিল। উপবাসের কষ্টে ওর বুড়ো মা এবং ছোট মেয়েটা মরল প্রথম। তারপর বস্তির কলেরা এসে নিল তার স্ত্রীও ছোট ছেলেটাকে। রইল একটী মাত্র ছেলে, তাকে বাঁচাবার জন্য নবী সেবারও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে কোথাও আর চাকরী জোটে না দেখে, ছেলের মুখে দুটী ভাত দেবার জন্য আবার সেই ম্যানেজারের পায়েই গিয়ে কেঁদে পড়ল। ম্যানেজার দেখলেন তার বিষ-দাঁত ভেঙ্গেছে। নবীকে তিনি এবার এমন কাজে নিযুক্ত কোরলেন, যার মাইনে হল অৰ্দ্ধেক অথচ খাটুনী দ্বিগুণ। এর ওপরেও গাফিলতী প্রভৃতি হরেক রকম অজুহাতে উপরি ফাইন ত লেগেই আছে। এই অন্যায় ফাইনের টাকা নিয়েই তার ম্যানেজারের সঙ্গে বিবাদ। নইলে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে অন্য সব রকমের অত্যাচার সে সইতে পারে।

রাত হয়েছে দেখে আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম, "কৈ, তুমি তোমার ছেলের ওষুধ আনতে গেলে না ?" পাড়ার একটা আধা-অন্ধ বুড়ীকে তার ছেলের কাছে বসিয়ে রেখে এসেছে মনে পড়াতে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল—"দাওয়াই ত সবেরমে লে আনে হোগা হুজুর, আভি হাম ঘর যাতা—" বলেই সে আর একটুও অপেক্ষা কোরল না।

মাত্র একদিন পরের কথা। সকাল বেলা ছোট ভাই বোনদের নিয়ে দরজার সামনে একটু দাড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় দেখলাম আরও তিন চার জন লোকের সঙ্গে নবী কালো কাপড়ে ঢাকা একটা তাজিয়া নিয়ে আসচে। নবীর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়েই বুঝলাম, শেষ সম্বল ওর ওই ছেলেটীও মারা গেল।

সেদিন রাত্রে আমাদের মধ্যে নবীর কথাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হল। বাবা বলছিলেন কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হতে হতে যারা মরিয়া হয়ে ওঠে, খুন করা আগুন লাগান কিছুই তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ছোট বোন আবার নবীর তাড়ি খাওয়ার টিপ্পনী করাতে বাবা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে অশিক্ষিত লোকেরা মনের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলবার জন্য এবং কঠিন পরিশ্রমের পর একটু ক্ষণিক সুখের আশায় ওসব কুঅভ্যাস করে। তাদের কাজের খাটুনী এবং অশিক্ষার সঙ্গে ওটা এমন ভাবে জড়িত যে শুধু বক্তৃতা দিয়ে ও-অভ্যাস ছাড়ানো কখনও সম্ভব নয়।

গভীর রাত্রে হঠাৎ সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে ভীষণ চীৎকার—"আগুন, আগুন!" বাইরে গিয়ে দেখি আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে, সেই দিক লক্ষ্য করে লোক ছুটোছুটী করছে।

নবীদের মিলেই আগুন লেগেছে। ওর ছেলেটা মারা গেল সকালে, আগুন লাগল মাঝ রাত্রে।

তুমুল হট্টগোল এবং চীৎকারের মধ্যে পুলিশ ও দমকল এসে হাজির হল। তারা ঠিক সময়ে এসে পড়াতে আগুন আর বেশীদূর বিস্তৃত হতে পারেনি। ভোর হবার আগেই আগুন নিভে গেল, কিন্তু নবীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউ বললে সে পাগল হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ বললে আগুনের মধ্যেই সে পুড়ে মরেছে।

আমি কিন্তু সব সময়তেই আশা করে থাকি যে নবীর দুঃখের জীবন সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যেই নিশ্চিহ্নভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে। তবুও যখন শুনি কোনও দেশে অন্তর্বিপ্লব ঘটেছে, কেউ কাউকে খুন করেছে কিংবা কোথাও আগুন লেগেছে, মনে হয় নবী মাথা নেড়ে বলছে,—তখনই দেখেছি নবীর সেই কথাগুলি কাণে বাজতে থাকে,—"আগ্ কভি এক রোজমে জ্বলতা হায় হুজুর !"

নোংরা পা

রোব্বার দিন বেলা প্রায় চারটে বাজে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ছায়া ঢাকা বারান্দাটাতে পা দিতেই প্রণব একটা বাধা পেলো।

"আপনিই প্রণব বাবু?"

প্রখর আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে প্রায় কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিলো না, তাই অনিশ্চিতের স্বরে জবাব দিলো—"হাঁ, কেন বলুন তো?"

"একটু বিশেষ দরকার ছিলো।"

ততক্ষণে চোখটা বেশ পরিস্কার হোয়ে এসেছে। প্রণব দেখলো তার সামনে শতছিন্ন ময়লা কাপড় পরা আধ-বয়সী একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

"আসুন এদিকে।" সাইকেলটাকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রেখে দুজনে গিয়ে পেছন দিককার সিঁড়িটাতে বোস্‌লো।

ভদ্রলোক আরম্ভ কোরলেন। তখনকার দিনের এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি গ্যাঞ্জেস্ হোসিয়ারী মিল নামে একটা মিলে প্রায় চৌদ্দ বছর ধোরে কাজ কোর্চ্ছেন। মিলটা গেঞ্জীর কল। আজ প্রায় বছর কুড়ি যাবৎ উচ্চহারে লভ্যাংশ বিতরণ করা সত্বেও কর্ম্মচারীদের মাইনের হার নিতান্তই শোচনীয়। ইতিমধ্যে জাপানী প্রতিযোগিতার ফল-স্বরূপ মিলের অবস্থা কিছুদিন হোল একটু খারাপ হোয়ে পড়েছে। প্রথম ত মিল-মালিকরা সব কর্ম্মচারীদের মাইনে কমিয়ে দিয়েই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন সেই কমানো মাইনেও তারা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখবেন বোলে নোটীশ দিয়েছেন। মাইনে বন্ধ হওয়া সত্বেও যারা কাজ কোরে যাবে, মিলের অবস্থা একটু ফিরলেই তাদেরকে বকেয়া মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে,

যারা চলে যাবে, ইতিমধ্যে একমাসের বাকী-পড়া মাইনে তারা পাবেই না। গরীব মানুষরা, যারা নাকি দিন আনে দিন খায় তাদের এক মাসের টাকাও না পেলে যে কি দুর্দ্দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়। মজুরেরা নিজেরা এ বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা কোরেও কোন পথ ঠিক কোরতে পারেনি; খিদিরপুর ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের কাছে তার নাম শুনে গ্যাঞ্জেস্ মিলের সমস্ত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ভদ্রলোক এই বিষয়েই প্রণবকে জানাতে এসেচেন। গ্যাঞ্জেস্ মিলের শ্রমিকরা নাকি আরও শুনেছে যে প্রণবের সাহায্যে আরও অনেক কলের মজুররা নিজেদের পাওনা আদায় করে নিতে সক্ষম হোয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যদি প্রণব একটু দয়া করে সাহায্য করে, ইত্যাদি।

প্রণব বেশ আগ্রহের সঙ্গেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং অত কোন কথার বোধহয় দরকারই ছিল না। দুঃখের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মন তার বেদনাভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেছিল, তাই সেদিন রাত্রেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অল্প কথাতেই তাকে বিদায় কোরলো। পাঁচটা বোধ হয় বাজে, কিছুক্ষণ আগে লাইব্রেরী বন্ধ হবার সঙ্কেত-ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল, ভেতরে গিয়ে দেখে তখন দরজা বন্ধ করা হচ্ছে, কিন্তু পড়ার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আশা ভঙ্গ-জনিত বিষণ্ণতার লক্ষণ তার মুখে কিছু দেখা গেল না। যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সে পথ দিয়ে বেড়িয়েই বড় রাস্তায় পড়ে হ্যারিসন রোডের দিকে রওনা হোল।

প্রণবের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। অখ্যাত-অজ্ঞাত নিতান্ত গরীব ঘরের আর দশ জন ছেলের মতো সেও একজন। পূর্ব্ব-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে তার বাড়ী। অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষায় ভালো করতে পারলো না

কারণ অতি-আবশ্যকীয় ক'খানা বই-ই সে যোগার করতে পারে নি। যার কাছেই হাত পাততো, দেখতো গরীব লোককে সাহায্য কোরতে সকলেরই উৎসাহের অভাব। স্কুলে ফ্রি-সিপ পেয়ে অতি কষ্টে ম্যাট্রিকের ফী জোগার করে পরীক্ষায় পাশ করে এলে কোলকাতায়। আশা, যদি ছোট-খাট একটা চাকরি বাকরী কিছু জুটে যায়।

বাবার চিঠি নিয়ে প্রথমে এসে যাদের বাড়ী উঠেছিল তাদের ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন অতিষ্ঠ হোয়ে পড়লো যে, তাকে পথেই বেরিয়ে পড়তে হোল শেষ পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে তারই সমান অবস্থার কয়েকটী বন্ধু জুটেছিল বরাতক্রমে। একজন তাকে দিল আশ্রয়, অপর জন সামান্য মাইনেতে খিদিরপুর ডকের কুলীসর্দ্দারের একটা চাকরী পাইয়ে দিল। প্রথম বন্ধুটী হ্যারিসন রোডের ওপর একটী মনোহারী জিনিষের দোকানে কাজ করতো ; সে দোকানের মালিককে না জানিয়ে আলমারীগুলির পেছনেই তার জন্য একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিল। রাস্তার কলে চান করে আর পাইস-হোটেলে খেয়ে কোন রকমে দিন কাটছিলো। বাবা চিররুগ্ন, আসবার সময় তিনি হৃদয়াবেগ গোপন রেখে ওর সাফল্য কামনা কোরে শুধু নীরব আশীর্ব্বাদই জানিয়েছিলেন। মা তার চোখের জলের সঙ্গে তাঁর শেষ সম্বল সামান্য একটী গয়না বিক্রী কোরে নগদ কয়েকটী টাকা হাতে দিয়ে দিলেন। সেই টাকারই উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে অনেক পুরোনো একটা সাইকেল কিনে সে যথারীতি "অফিস" সুরু করলো।

এখানেই সে প্রথম শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসে। সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দরিদ্রের দুঃখ বুঝতে শিখেছিল, সুতরাং অন্যান্য কুলী-সর্দ্দারের মতো গরীব কুলীদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে অভ্যস্ত হোতে পারলো না, বরং এরকম কোন অবিচার দেখলে তার মুখ থেকে স্বতঃই প্রতিবাদের ভাষা বেরিয়ে আসতো। ক্রমশঃ শ্রমিকরা

তাকে হিতৈষী বলে বুঝ্‌তে পারলো এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথাও তারই কাছে জানাতে লাগলো। কখন যে এদেরই কাজে সে নিজকে ভুললো সে নিজেও তা জানলো না, মোট ফল স্বরূপ একদিন সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে চাকরিটা হারালো।

ইতিমধ্যে বাইরের অনেক বিষয়ে তার চোখ খুলেছিল। এ চাকরি যাবার পরে সে অর্ডার-সাপ্লাইং ব্যবসা ধরলো এবং স্বাধীন হওয়ার এসব আন্দোলন পরিচালনা করা তার পক্ষে আরও সোজা হোল। অনেকের অনেক রকম উচ্চাকাঙ্খা থাকে, প্রণবের উচ্চাকাঙ্খা ছিল পড়বার, বিশেষতঃ কলেজে পড়বার; কিন্তু বাড়ীতে টাকা পাঠিয়ে এতবড় ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। ম্যাট্রিকে তেমন কিছুতো আর ভাল করতে পারেনি অথচ তেমন কারুর সঙ্গে চেনাশুনাও নেই যে "ফ্রি-শিপ" জোগার করবে, এদিকে টুশানিও জোটে না। দিনে কলেজে যাওয়া ছেলেদের গতিবিধি সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতো, রাত্রে স্বপ্নে দেখতো যে কলেজে পড়ছে; যখনি সময় পেত ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতো, মনকে বোঝাতো যে শুধু একটা ডিগ্রীর মোহ ত? কিন্তু মন মানতো না।

তার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানতো যে প্রণবকে রবিবার দিন দুপুর বেলা ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। গ্যাঞ্জেস্ মিলের ভদ্রলোকও সে খোঁজ পেয়েই এসেছিলেন।

অল্পদিন যাবৎ কোলকাতায় এলেও গ্যাঞ্জেস্ মিল কিন্তু ওর অজানা নয়। ও এসেই যে জ্ঞাতি-কাকার বাড়ীতে উঠেছিল তিনিই তার ম্যানেজার। প্রণব পৃথিবীটাকে ঠিক তখনও চিনে উঠতে পারেনি। উৎসাহের আবেগে ওর নিজের প্রতি যে অত্যাচার হোয়েছিল সে কথা ভুললো। সরল মনে ভাবলো যে চরম পন্থা অবলম্বন কোরবার আগে

একবার ম্যানেজার মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে দেখলে হয়। দেখি তিনি কি বলেন। তেমন ভাবে বলতে পারলে কাজ হবে না কি ?

হরিহর বাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে বাইরের ঘরেই ছিলেন। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় প্রণব গিয়ে উপস্থিত হোল। হরিহর বাবুর স্ত্রীর মুখে স্পষ্টতঃ অসন্তোষের ছায়াপাত হওয়া সত্ত্বেও সে দমলো না, মনে মনে ভাবলো নিজের জন্যে ত আর আসিনি।

কাকা কাথায়, এই প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে উত্তর এলো যে তিনি বিশ্রামে ব্যস্ত আছেন, যা বলবার তা তাঁকেই বলা যেতে পারে।

প্রণব অত্যন্ত বিনীত ভাবে জানালো যে বিষয়টা তার নিজের নয় মিল-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার।

মিল কথাটা শোনা মাত্রেই কাকীমা যেন জলে উঠ্‌লেন। মিল-মজুর নামধারী কতকগুলি ঘৃণিত জীব যে তাদের পাওনা টাকা চাওয়ার মতো গুরুতর অন্যায় আবদার কোরে হরিহর বাবুর অশান্তি সৃষ্টি কোরেছে তা তিনি স্বয়ং স্বামীর মুখ থেকে শুনেছিলেন, আরও জানি কোত্থেকে শুনেছিলেন যে প্রণব আজকাল সব জায়গাতেই মজুরদের ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করে।

"ও! এসব গণ্ডগোলের গোড়াতেও তুমিই রয়েছ, তাই ভাবি এসব অসভ্যগুলির মাথায় বুদ্ধি জোগায় কে? তা আর হবে না, যেমন ইতর নোংরা নিজে তেমন ইতর নোংরা লোকের সঙ্গেই তো মিশবে। দেখেছিস্ লীলা! দেখেছিস্ কি নোংরা গতর, কি নোংরা জামা-কাপড়, দেখ্ একবার পা দু'খানা—এই নোংরা পা নিয়ে ভদ্রলোকের বাসায় আসতে একটু লজ্জাও হোল না ?"

লীলা তার মায়ের ব্যবহারে বিশেষ লজ্জিত হচ্ছিলো, সে মাথা ওঠাল না। প্রণবের অপরাধ যে স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন জুতো

কিনবার ক্ষমতা তার নেই ; সুতরাং রাস্তায় বেশী ঘুরাঘুরি কোরলেই পা নোংরা হওয়া স্বাভাবিক, কাপড় চোপড়ও যে খুব ময়লা ছিল তা ঠিক নয়। ধোপ-দুরস্ত কাপড়ের অভাবে নিজের হাতে কাচা কাপড়ই সে পড়তো। এ বাড়ীতে থাকবার সময় এ ধরণের কথা হাজার বারও সে শুনেছে, আজ সে তার শ্রমিকদের হোয়ে বোলতে এসেছিল, কেন জানিনা "নোংরামীর" অভিযোগ আজকে তাকে মর্ম্মবিদ্ধ করলো। সে আবার নতুন কোরে বুঝলো যে গরীবের অসমর্থতা বড়লোকের চোখে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সমান চালে চলবার ক্ষমতা না থাকলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও নেহাৎ অর্থহীন হোয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ সে আত্মীয়তার দাবী নিয়ে আসেনি, এসেছে সে যা কর্ত্তব্য মনে করে তারই তাগিদ নিয়ে, সুতরাং এত কটুক্তির পরও অটল রইলো।

প্রণবকে নেহাৎ নাছোড়বান্দা দেখে কাকীমা উঠে ভেতরদিকে গেলেন। লীলা এতক্ষণ পরে মুখ উঠিয়ে প্রণবকে বসতে বললো। লীলা এম, এ পড়ে, প্রণবের চেয়ে বছোর পাঁচ ছয়ের বড়ো। লীলার ভাইবোন আর কিছু ছিল না, মনটাও ছিল তার বাপ মায়ের তুলনায় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। কোলকাতায় প্রথম এসে প্রণব সহানুভূতি যা কিছু তা লীলার কাছ থেকেই পেত, যে কদিন ও' এ বাড়ীতে ছিলো সে কদিনের ভেতরই দুজনের মধ্যে একটা স্নেহ-মমতার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তার মায়ের ব্যবহারের ফল স্বরূপ ঘরের আবহাওয়াটা লীলার কাছে রীতিমত তিক্ত মনে হচ্ছিল, তাই সে প্রণবের সঙ্গে আর কিছু কথাই বলতে পারলো না। প্রণব লীলার মনের এই ভাব ঠিক না-বুঝতে পেরে তার কথা না বলার জন্য দুঃখিত হোল।

ইতিমধ্যে চাকর এসে জানাল যে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। প্রণব জিজ্ঞেস কোরলো যে, সে অন্য আর কোন সময় আসতে পারে কিনা ;

চাকর আবার ঘুরে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে অন্ত আর কোন সময়ও দেখা হবে না।

লীলার দিকে চেয়ে দেখে সে তখনও তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই বসে আছে, প্রণব বাইরে বেরোবার সময় মনে মনে ভাবলো, তবে কি লীলাদিও আজকাল আমাকে ঘৃণা করে ?

কিন্তু এসব কথা চিন্তা করার সময় তখন নয়, সে সোজা মিল বস্তীর দিকে রওনা হোল।

প্রণবের প্রথম দরকার দুপুর বেলার সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা। নামটা আগেই জেনে নিয়েছিলো। দেখলো যে মতিবাবু মিল অঞ্চলে বিশেষ পরিচিতই। একটা লাইট-পোষ্টের কাছে খোলার ঘরের দাওয়ায় তাঁর দেখা মিললো। আরও কয়েকজন নেতা-শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিলো। যথারীতিতে পরিচিত হওয়ার পর অবিলম্বে পরামর্শ সভা বোসলো। মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী থেকে আরম্ভ কোরে কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে একবার হরিহর বাবুর সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছিল এবং তার ফলাফলই বা কি হ'ল সে-সব কথা সে বিশদভাবেই সেই সভাতে বিবৃত কোরলো। বড়লোকেরা হয় বোঝে টাকার জোর, না হয় বোঝে গায়ের জোর, কিন্তু মজুরদের এর দুটোর একটাও প্রয়োগ করবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং একটা তৃতীয় পন্থা ধরতে হবে। বড়লোকদের টাকার জন্য বড় মমতা। যখন এই গ্যাঞ্জেস্ মিলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নিজেদের মধ্যে গত যুদ্ধের সময় উচ্চহারে লভ্যাংশ বণ্টন কোরে নিয়েছে তখন তারা এই শ্রমিকদের কি সুযোগ সুবিধেটা দিয়েছিলো ?

পুরানো যারা শ্রমিক ছিল তারা সমস্বরে জানালো যে কিছুই দেয়নি।

কিন্তু আজকে যখন জাপানী প্রতিযোগিতায় মাত্র কয়েকমাস যাবৎ লোকসান হচ্ছে, তখন এরা ভুলে গেছে সেই মহাযুদ্ধের সময়কার মোটা মুনাফার কথা, ভুলেছে যে সেই লাভের একটু উচ্ছিষ্ট কণিকাও এই শ্রমিকদের তারা দেয়নি, আজ তারা নিজেদের লাভের কড়ি বজায় রাখবার জন্য অসহায়, অশিক্ষিত শ্রমিকদের ওপরেই চালিয়েছে জুলুম, এটা ঠিক কোন্ হিসেব অনুসারে করা হচ্ছে তা জানবার অধিকার নিশ্চয়ই এই শ্রমিকদের আছে।

এই ধনিকদলের পোষা অর্থনীতিবিদ্‌রাই বলে থাকেন যে ধনীরা যখন তাদের মূলধন খাটায়, তার লভ্যাংশ যেমন তাদের প্রাপ্য, লোকসান হ'লে সেটাও তাদের হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা কি দেখতে পাই ? লোকসানের বেলা সেটা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শুধু লাভের সময়ই তারা এগিয়ে আসে না কি ?

আগে একবার বলেছি যে বড়লোকদের টাকার ওপর বড় মমতা, সামান্য কিছুদিনের জন্য সামান্য টাকা লোকসান হওয়ার ভয়ে শ্রমিকদেরকে তাদের দৈনন্দিন আহার থেকে বঞ্চিত কোরতেও তারা কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু আমরা যদি একমন আর একপ্রাণ হোয়ে আজকে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যে এই বঞ্চনা কোরবার প্রয়াসে তারা নিজেরাই বঞ্চিত হচ্ছে বলে বুঝতে পারে, তা'হলেই আবার আমাদের পূর্ব্বাবস্থা অন্ততঃ ফিরে আসবে। অত্যন্ত স্পষ্ট আর পরিষ্কার ভাষাতে এই কথাগুলিই সমবেত সকলকে বুঝিয়ে দিল এবং ঠিক হোল যে রাত সাড়ে বারোটার মধ্যে সকল শ্রমিককে ডেকে তারপরই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন।

হাজাক্ লণ্ঠন যোগার করে রাত বারটার সময় মস্ত এক সভার অধিবেশন হোল। সকলেরই রুটী নিয়ে টান পড়েছে সুতরাং কেউ

গড় হাজির আছে বোলে মনে হোল না। চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত আর গভীর হতাশার চাহনি, ওদের দুঃখ প্রণব অন্তরের সঙ্গে বুঝছিলো। ওর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে কেউ মনেই কোরতে পারলো না যে সে এই মিলের বাইরের কেউ অথবা এই বঞ্চিতদেরই একজন নয়। পরামর্শ সভায় সে যা বলেছিলো তাই সে বললো আরও বিশদ ভাবে, সরল ভাবে এবং আরও জোরালো ভাষায়, সাধারণ মজুরদের বোঝাবার জন্য। মালিকদের ক্ষমতা টাকার ক্ষমতা, মজুরের তা নেই, কিন্তু মজুর ছাড়া তাদের মিল চলতে পারে না। মজুরদের ভেতর একতার অভাব, তাই কিছু করবে মনে কোরলেও কোরতে পারে না।

মজুরদের প্রথম কাজ হবে একতাবদ্ধ হওয়া, এবং এই একতা আনতে হ'লে দরকার ইউনিয়ন সংগঠনের। ট্রেড্ ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রণব তাদের বুঝিয়ে দিলো। প্রণব ষ্ট্রাইক সম্বন্ধেও আলোচনা করলো, সে আবার বললো যে মালিকরা তাদের লাভের লোভেই মাইনে সম্বন্ধে গণ্ডগোল বাধায়; কিন্তু যখন দেখে যে ধর্ম্মঘটের ফলে উল্টো লোকসান হ'তে আরম্ভ করে তখনই তাদের চেতনা হয়। এই লাভ লোকসান খতিয়েই মজুরদের অভিযোগে তারা কর্ণপাত করে, দয়াপরবশ হোয়ে নয়।

চারদিকে রব উঠলো অবিলম্বে ষ্ট্রাইক করো। কেউ কেউ আবার ষ্ট্রাইকের ফলাফল সম্বন্ধে ভীত হোল। শেষে ঠিক হোল যে ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী কোরে নিয়ে মালিকদের ইউনিয়নের তরফ থেকে একখানা শেষ চিঠি দেওয়া হোক্, এবং এর ফলাফল দেখে তবে ষ্ট্রাইক।

শেষ চিঠির ফলাফল যে কি হবে প্রণব আগেই তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু চরমপন্থা অবলম্বন কোরবার আগে অন্য সব উপায়গুলি পরখ করা দরকার, নয়ত ষ্ট্রাইক সফল না হোলে দোষটা পড়বে প্রণবের ওপর।

ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রী ইত্যাদি হোতে তিন দিন আরও সময় লাগলো। তারপর তাদের দাবীদাওয়া জানিয়ে শেষ চিঠি একখানা পিয়ন-বইয়ে কোরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল স্বয়ং ম্যানেজারের কাছে। ইউনিয়ন গঠিত হোয়েছে শুনে ম্যানেজার মহাশয় পূর্ব্ব থেকেই যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। চিঠি পাঠানোর ধৃষ্টতায় ক্রোধান্ধ হোয়ে চিঠি না রেখেই পত্রবাহক ছেলেটিকে তিনি একরকম গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিলেন।

তখন আর উপায়ন্তর নাই, ষ্ট্রাইক সুরু হোল। হরিহর বাবু ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে ধর্ম্মঘটের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, ভাবলেন যে নিজেদের মুর্খতা ওরা খুব শিগ্‌গীর বুঝবে, ততদিন নিজেরা না হয় একটু ছুটি ভোগ করি। প্রণবরা কিন্তু বেশী দিনের জন্যই প্রস্তুত ছিলো। সাতদিনেও যখন ষ্ট্রাইক ভাঙ্গলো না, মিল-মালিকরা তখন চিন্তিত হোলেন। হরিহর বাবু ষ্ট্রাইক কোরবার কুফল বুঝিয়ে লম্বা এক নোটীশ জারী কোরলেন, প্রণবকে বিভীষিকাবাদী দলের লোক বলে প্রচার কোরে ধর্ম্মঘটকারীদের পুলিশের ভয় দেখাতে লাগলেন। ধর্ম্মঘটিরা কিন্তু এতে দমলো না, তারা জানালো যে প্রণব খুব খারাপ রকমের লোক হোলেও তাদের কিছুমাত্র এসে যায় না, শুধু তাদের প্রাপ্যটা চুকিয়ে দিলেই আবার তারা কাজে যোগ দেবে, নচেৎ নয়।

এমনি কোরে কাটলো আরও সাতটী দিন। প্রবল আক্রোশের বশবর্ত্তী হোয়ে হরিহর বাবু সব মজুরকেই একসঙ্গে বরখাস্ত কোরলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর কাছে একটীও শ্রমিক ক্ষমা প্রার্থনা কোরতে এলো না। এবার তিনি অন্য পন্থা ধরলেন।

লেবার কণ্ট্রাক্টার দিয়ে দূরের এক মিল-অঞ্চল থেকে নতুন শ্রমিক এনে কাজে নিযুক্ত কোরতে সুরু কোরলেন। একদিকে প্রবল জেদ,

অপরদিকে নিদারুণ দুর্দ্দশা আর মরিয়া হওয়া ভাব ; তৃতীয় সপ্তাহের পরে এ দুয়ের সংঘর্ষে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হোল।

নতুন কোরে যারা কাজে যোগ দেবে তাদেরকে বকেয়া মাইনে না দিলেও চলতি মাসে ঠিক দেওয়া হবে বলে একটা বিজ্ঞপ্তী দেওয়াতে গরীব শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে বিচলিত হোল, এদিকে অন্য কোন জায়গা থেকে শ্রমিক এসে যাতে কাজে যোগ না দেয় তার জন্য পিকেটিং দরকার। অবিলম্বে পিকেটিং কোরবার জন্য প্রণব স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করলো।

পিকেটিংয়ে আশাপ্রদ ফল হওয়াতে হরিহর বাবু এর প্রতিহিংসা নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলেন। প্রণবই মজুরদের সব আশাভরসা মনে কোরে তাঁর সমস্ত রাগটা পড়লো প্রণবেরই ওপর ; তাকে শায়েস্তা কোরবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হোল।

গ্যাঞ্জেস্ মিলটি উল্টাডাঙ্গার একটা নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। সেদিন সমস্ত দিনই লরী বোঝাই হোয়ে দলে দলে নতুন শ্রমিক আসচে। হরিহর বাবুর বোধহয় ঝোঁক চেপেছিল যে, রাত হোক আর যাই হোক তিনি যেমন করে পারেন মিল চালাবেনই চালাবেন ; সুতরাং সন্ধ্যের অন্ধকারের পরও প্রণব ও তার ভলান্টিয়ার দলকে পিকেটিং কোরতে হোয়েছিল। নতুন শ্রমিকদের মিলে ঢুকবার নানারকম প্রয়াস ও প্রণবদের অনুনয় বিনয়ের সাহায্যে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া, অন্যান্য দিনের মত আজকেও এসব বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলেছিল। হঠাৎ যে কোনদিক দিয়ে কি হোয়ে গেল তা সকলে বুঝবার আগেই প্রণব ও তাদের দলের অধিকাংশই অপরপক্ষের অবিরাম লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হোল। যারা মেরেছিলো নিশ্চয়ই তারা প্রণবকে নেতা বলে চিনতো, সে সবচেয়ে গুরুতর রকম আহত হোল। প্রণব পড়ে যাবার পরেই সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই গুণ্ডার দল যে কোথায় উধাও হোল কেউ তা জানলো না।

খবরটা দেখতে দেখতে সমস্ত মিল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াতে চারদিকে একটা প্রবল উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মতিবাবু সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরে প্রথমে প্রণবের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ কোরলেন। মতিবাবুও নিজে আহত হোয়েছিলেন, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়।

ডাক্তার এসে প্রণবকে দেখলেন মতিবাবুর বাড়ীতে। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা ক'রে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে উপদেশ দিলেন। প্রাণের আশা নেই বুঝতে পেরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে পুলিশেও খবর দিয়ে দিলেন।

প্রণব আর বাঁচবে না এ কথা হরিহর বাবুর কানেও যথাসময়ে পৌছল। তিনি অনুতপ্ত হোয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি, বোধহয় একেবারে খুন করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। পুলিশী তদারকের কথা শুনে অন্যান্য কাপুরুষের ন্যায় তিনিও অত্যন্ত ভীত হোলেন। ষ্ট্রাইক আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রীও প্রণবের মুণ্ডপাত না কোরে কোনদিন অন্ন-গ্রহণ কোরতেন না, এ সংবাদের পর অবশ্য তিনি থামলেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা যে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে পরামর্শ কোরে লীলাকে পাঠালেন অনুনয় বিনয় কোরে মাতিবাবুর বাড়ী থেকে প্রণবকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্য; কারণ মৃত্যুকালীন জবানবন্দীটা নিজেদের অনুকূলে হওয়া দরকার।

লীলার মন সত্যিই কাঁদছিল কিন্তু প্রণব তার নোংরা পা'র কথা ভুলতে পারেনি। তাই সে এলো না। সে তার লীলাদির কাছে প্রতিশ্রুত হোল যে ধর্ম্মঘটকারীদের দাবী মেনে নিলেই সে সকলকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কোরবে, ব্যক্তিগত অভিযোগ তার কিছু নেই।

কখন যে সে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিল প্রণব তা টের পায়নি। জ্ঞান হোয়ে দেখে যে সে হাসপাতালে। সাদা পোষাক পরা বৃদ্ধ এক

সাহেব ডাক্তার তার সম্বন্ধেই যেন কি আলোচনা কোরছেন, প্রণব লক্ষ্য কোরলো সাহেবের বুকে টক্‌টকে লাল একটা গোলাপ ফুল। নার্স এসে তার উত্তাপ নিলেন। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের সু-অভিজ্ঞা বৃদ্ধা নার্স, বয়স এবং সজাগ কর্ম্মব্যস্ততার নিদর্শনস্বরূপ মুখে অসংখ্য রেখাপাত হোয়েছে, প্রণব তাঁর আন্তরিক দয়ায় চমৎকৃত হোল, মুগ্ধ হোল। মনে পড়লো তার মায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে বাবা আর অন্য সকলের কথা। তাঁরা সকলে বড় আশা করেছিলেন, প্রণব মানুষ হোয়ে তাঁদের সব দুঃখ দূর কোরবে, মনে মনে সকলের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা কোরে নিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

নার্স আর চাপরাশীদের ফাঁকি দিয়ে মতিবাবু কি রকম কোরে যেন অসময়েই হাসপাতালের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। গভীর আনন্দের সঙ্গে তিনি জানালেন যে মালিকেরা তাদের সমস্ত দাবীই মেনে নিয়েছে। জবাব দিতে গিয়ে প্রণব দেখে যে তার বাকশক্তি ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে, নিজের আনন্দ জানাবার জন্য মতিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু একটু হাসতে পারলো।

তখন শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না, তারা মনে কোরতো যে এসব স্বদেশী শিল্প ধ্বংস কোরবার জন্য দুষ্টু লোকের কারসাজী; সুতরাং প্রণবের এই মৃত্যুতে কোন রকম হৈ চৈ হোল না। সামান্য মিল-শ্রমিকরা যখন তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেল তখন কারো মনে বিশেষ কোন কৌতূহল জাগার কথা নয়; কিন্তু কেউ যদি একটু লক্ষ্য করতো তো দেখতে পেত যে প্রণবের মুখে তখনও একটী স্মিত হাসির রেখা লেগে রয়েছে।

প্রণব কি শেষ পর্য্যন্ত তার নোংরা পায়ের দুঃখ ভুলেছিল?

সৈনিক

Private Smith যখন সামান্য চুরির অপরাধেই তৃতীয় বার জেলের দরজায় পা দিল তখন সামান্য কয়েদী ও ওয়ার্ডার থেকে স্বয়ং জেলর পর্য্যন্ত বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

বাস্তবিক পক্ষে সে যখন সৈনিকোচিত দৃঢ় এবং লম্বা পদক্ষেপে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের মতই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াতো, তখন ছয় ফিট লম্বা দেহের উপরাংশে স্থাপিত নির্দ্দোষ এবং সরল মুখখানার দিকে চেয়ে তাকে সামান্য ছিঁচকে চোর বলে ভাবা একান্তই অসম্ভব ছিল। সমস্ত জেলের মধ্যে তার মতো বাধ্য আর নরম স্বভাবের কয়েদী আর একটীও ছিল না। তার এই রকম সুন্দর আচরণের জন্যই গত দুবার সে নির্দ্দিষ্ট দণ্ডভোগের আগেই মুক্তি পেয়েছিল।

বৃদ্ধ জেলর মানব চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। জেলের আবহাওয়ার সঙ্গে স্মিথের এই চরিত্রগত অসামঞ্জস্য তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কোরতেন। স্মিথের মানসিক ধারা ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি উত্তরোত্তর কৌতুহলী হয়ে উঠছিলেন। একদিন তিনি স্মিথকে তার নিজের বিশেষ কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

স্মিথ এসে দাঁড়াল। মুখে কিংবা হাবভাবে অপরাধী সুলভ কোনরকম ভয় কিংবা দ্বিধার চিহ্ন নেই। সৈনিকদের বিলাসিতার অঙ্গ স্বরূপ বক্ষে আর বাহুতে কতগুলি উল্কীরেখা।

যদিও জেলের বইতে তার অপরাধ ইত্যাদি সব কিছুই লেখা ছিল, জেলর আরেকবার জিজ্ঞেস কোরলেন "কি দোষ কোরে জেলে এসেছো ?"

"আজ্ঞে চুরি।"

জেলর এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আশা করেন নি, তিনি ভেবেছিলেন যে অন্যান্য শতকরা নিরেনব্বইজন কয়েদীর মত সেও বলবে

যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সনাক্ত-করণের ভুলে, বিচার বিভ্রাটে, পুলিশের আক্রোশ বশতঃ অথবা শত্রুদের চক্রান্তেই সে জেলে এসেছে বলে কোন রকম একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসবে। স্মিথের ক্ষেত্রে তিনি হয়তো এরকম সাফাই বরদাস্ত কোরতেও রাজী ছিলেন, কিন্তু এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি জন্য তার ওপর জেলরের শ্রদ্ধা বাড়লো ছাড়া কমলো না। তিনি একটা চেয়ার আনিয়ে তাকে বসতে দিয়ে সম্মানিত কোরলেন।

"কি চুরি কোরেছিলে ?"

"একটা ঘড়ি।"

"এর আগের বার ?"

"একটা সার্ট।"

"তার আগের বার ?"

"এক বাক্স চুরুট।"

প্রত্যেকটা চুরির ইতিহাসও তিনি শুনলেন এবং তাতে কোন রকম কৌশলের নিতান্ত অভাবও লক্ষ্য কোরলেন।

"দেখ একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, তোমরা সৈন্যরা যা রোজগার করো তা দিয়ে সামান্য একটা ঘড়ি, সার্ট অথবা একবাক্স চুরুট কেনা মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কেমন ?"

"না, মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।"

"তবে চুরি করতে যাও কেন ?"

স্মিথ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জেলরের মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছিল যে একটা বিজাতীয় হতভাগ্য চোরের সম্বন্ধে জানবার জন্য জেলরের মত একজন লোকের প্রকৃত আগ্রহ হওয়া সম্ভব কিনা।

"স্বভাব" এই কথা বললেই সে সকল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারতো ; কিন্তু জেলরের আন্তরিকতা তাকে যেন কোথায় স্পর্শ কোরেছিল, বললো—"সে তো অনেক কথা, আপনি কি সত্যিই শুনতে চান ?"

"আমার বাস্তবিকই বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে, যতক্ষণই সময় লাগুক আমার অনুরোধ তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধুভাবে আমার কাছে সব কথা খুলে বল।"

স্মিথের চোখে একটা স্বপ্নাতুর ভাব ফুটে উঠলো, বললো "আচ্ছা শুনুন তবে।"

স্কটল্যাণ্ডের এলাকায় এবং ইংলণ্ডের সীমানায় একটা নিতান্ত অখ্যাত পল্লীগ্রামে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন অতি সাধারণ অবস্থার একজন চাষী-গৃহস্থ। বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর সংসার যখন এসে আমার ঘাড়ে পড়লো, আমার পোষ্য সংখ্যা ছিল তিনজন, খুব বুড়ী একজন আমার পিসী, আমার মা, আর আমার বউ। বাবা বেঁচে থাকতে কোনদিন টের পাইনি যে আমাদের বাজারে এত ধার ছিল, বাবা তাদের কেমন কোরে দাবিয়ে রেখেছিলেন জানি না ; তিনি মারা যাবার ঠিক পরেই তারা একযোগে এসে জুলুম চালাতে লাগলো। এইসব মহাজন আর সরকারী আইন-আদালতের দৌলতে সর্ব্বহারায় পরিণত হোতে বিশেষ দেরী হোল না।

স্বাস্থ্য আমার বরাবরই বিশেষ রকম একটু ভাল। পরের জমিতে লাঙ্গল ঠেলার দিন-মজুরী কোরেও সংসার চলছিল কোন রকমে, এমন সময় আমার বউ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একটা বিশেষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হোয়ে পড়লো। গরীবের ঘরে কঠিন রোগ হওয়া যে কি নিদারুণ দুর্ঘটনা, ভাষায় আমি তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। স্পষ্ট বুঝ্‌লাম যে, হয় আমাকে যেমন কোরে হোক্‌ ওষুধ কেনবার

টাকা জোগার করতে হবে, নয়তো ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছি এরকম একটা আত্ম-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দেখতে হবে।

এক পয়সার সম্পত্তিও আমার তখন অবশিষ্ট নেই; সুতরাং টাকাও আমাকে কেউ ধার দিলে না! কোত্থেকে এবং কি কোরলে টাকা পাওয়া যাবে?—গ্রামের সরাইখানায় এক চতুর্থাংশ পাইট চোলাই মদ কিনে (তার কম আর কিনতে পাওয়া যায় না) খেতে খেতে শুধু এই কথাই ভাব্‌ছিলাম।

নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলাম, তাই এতক্ষণ দেখ্‌তে পাই নি। ঠিক আমারই মুখোমুখি বসে সুন্দর সুবেশধারী একজন ভদ্রলোক প্রচুর ভোজ্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার কোরছিলেন। গ্রামের কোন সরাইখানাতে এরকম কোন পোষাক পরা ভদ্রলোকের আমদানি হওয়া যে একটু অস্বাভাবিক, এ বিষয়টা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লাম ভদ্রলোক আমাকেই দেখছেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে। আমাকে এত ভাল করে দেখ্‌বার কি থাকতে পারে? শতছিন্ন জামা-কাপড়ের ভেতর দিয়ে দারিদ্র্য অতি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, মনে মনে একটু লজ্জিতই হচ্ছিলাম।

কিন্তু তিনি আমারই পাশে এসে বসলেন এবং কেমন কোরে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে ফেললেন। সেই ভদ্রলোকের চেহারা এবং হাবভাবে এমন একটা কিছু ছিল, যার প্রভাবে আমি আত্ম-বিস্মৃত হোয়ে পড়েছিলাম। তিনি যখন সরাইখানার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্য কিনে আমাকে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন, আমি একটুও আপত্তি করতে পারলাম না। কথায় কথায় তিনি আমায় জিজ্ঞেস্ কোরলেন যে, আমার সকল সময়ের এই বিমর্ষতা আর হতাশভাবের

কারণ কি, এত উৎকৃষ্ট মদ খেয়েও আমি প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারছিনা কেন ?

প্রথম যখন আমি আমার সমূহ বিপদের কথা অকপট চিত্তে খুলে বললাম, তিনি বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখালেন বলে মনে হোল না। আমারও তাঁর সম্বন্ধে ক্রমশঃই বিশেষ কৌতূহল জাগছিল; তিনি কি করেন, এই গ্রামেই বা এসেছেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে, দু'হাতে ছড়াবার জন্য এত টাকাই বা পান কোত্থেকে, এই সব কথা। তাঁকে জিজ্ঞেস্ করতে তিনি বললেন যে, তিনি যে-ঐশ্বর্যের মালিক আমিও ইচ্ছে করলেই সেই ঐশ্বর্য্যের মালিক হোতে পারি। তাঁর কথায় আমি বিশেষ একটু বিস্মিত হোলাম, জিজ্ঞেস্ করলাম—"কি রকম ?"

"তুমি নিশ্চয়ই কাপুরুষ নও ?"

"নিশ্চয়ই না, স্কচ্ সীমান্তের লোকেরা কেউ কাপুরুষ হয় না।"

তখন তিনি আত্মপরিচয় দিলেন, বল্লেন তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একজন সামরিক কর্ম্মচারী, সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাম গুলিতে একটা মোটামুটি সফর দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাকে দেখে তিনি বিশেষ গুণমুগ্ধ হোয়ে পড়েছেন এবং তিনি একটু দয়া করলেই আমাকে সৈন্য দলে ভর্ত্তি কোরে নিয়ে আমার সকল দুঃখ দূর কোরে দিতে পারেন।

পরে জেনেছিলাম যে এরকম ধরণের সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে Recruitment officer বলে। সহরের কসাইখানার জন্য ফরিয়ারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেই কাজ করে, এরাও ঠিক সেই কাজই করেন এবং এর জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃতও হন। থাক্ সে কথা, তিনি আমাকে চিন্তা করবার জন্য বিশেষ সময় দিলেন না, আমার স্ত্রীর নাম কোরে আমাকে আগাম কিছু টাকা দিয়ে একেবারে বাধ্যবাধকতার আওতায় নিয়ে ফেল্লেন।

মোটামুটি একটা স্বস্তির ভাব নিয়ে মা-বৌয়ের হাতে যখন টাকা ক'টা তুলে দিলাম তখন তারাও কম বিস্মিত হয়নি। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী চুরি প্রভৃতি অসৎ কাজকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সৈন্য দলে ভর্ত্তি হওয়ার কথা মুখ খুলে শেষ পর্য্যন্ত আর বলতে পারলাম না। টাকা অসদুপায়ে অর্জ্জিত নয় এই কথায় আশ্বস্ত কোরে কোন রকম বিদায় বাণী না জানিয়েই জীবন-মরণের অনিশ্চিত পথের যাত্রী হোতে হোল। আমার স্ত্রীকে তার ওরকম অবস্থায় ফেলে গোপনে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সে বিশেষ ভীত ও দুঃখিত হোয়েছিল। সেই সরাই-খানায় আলাপ হওয়া ভদ্রলোক আমায় বিশেষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে ছুটী নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবো, আমার বাড়ীর সকলকেও সেই কথা চিঠিতে জানিয়ে সান্ত্বনা দিলাম।

আগে বলেছি যে স্কচ সীমান্তে আমার বাড়ী। বহু যুগ-যুগান্তর কাল থেকে এই সীমান্তের আশেপাশে ইংলণ্ড আর স্কট্‌ল্যাণ্ডের অনবরত যুদ্ধ চলেছে। চারপাশে আর মাঠেঘাটে সেই সব যুদ্ধেরই ইতিহাস রয়েছে জড়িয়ে। লাঙ্গল ধরে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হোলেও, এই সব গাথা আর ইতিবৃত্তের আওতাতেই আমি মানুষ সুতরাং পূর্ণ-শিক্ষা সম্পন্ন '2159 Borderers Regiment' নামক পদাতিক সৈন্যদলের সৈন্য হোতে বিশেষ দেরী হোল না। এদিকে যদিও উপযুক্ত চিকিৎসার দৌলতে আমার স্ত্রীর অসুখ সেরে গিয়েছিল, সেই বারই প্রথম কিনা তাই প্রসবের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হোচ্ছিল, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে ততই সে ভীত হোয়ে পড়ছিল। প্রত্যেক চিঠিতেই ভীত মনের জিজ্ঞাসা "তুমি কবে আসবে?"

বাড়ীতে একটীও সমর্থ লোক নেই, দুশ্চিন্তা আমারও কম নয়, কিন্তু উপায় নেই, হাজার হাজার সৈন্যের সঙ্গে পা' মিলিয়ে নীরবে মার্চ্চ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্র। অদূরে অবস্থিত একদল জার্মাণ সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ কোরবার জন্য Storm Lancers নামক একদল বল্লমধারী অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছত্রভঙ্গ করার কাজে যদিও বল্লমধারী সৈন্যদলই সবচেয়ে পটু কিন্তু বন্দুক না থাকাতে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা বিশেষ কঠিন। সুতরাং 2।59 Borderers Regimentএর ওপর আদেশ এল তা'দিগকে গার্ড করে নিয়ে যাবার জন্য।

গভীর রাতের অন্ধকার, আমার প্রথম যুদ্ধ-যাত্রার জন্য উদ্যোগের সঙ্গে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় বাড়ীর চিঠি এল। মা আর পিসিমা লেখা-পড়া জানে না, স্ত্রীই লিখেছে নিশ্চই, কি লিখেছে সে ? লাউড স্পীকারের মারফৎ কঠিন কণ্ঠের আদেশ এল, "যে যার জায়গায় চলো, যে যার জায়গায় চলো" সুতরাং চিঠিখানাকে না-খোলা অবস্থাতেই পকেটে রাখতে হোল।

হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অশ্বারোহী সৈন্যদলকে গার্ড করবার জন্য পদাতিক সৈন্যদল সমান তালে কেমন করে চলবে ? এ প্রশ্নটা আমাদের মনেও প্রথমে জেগেছিল, কিন্তু সমর বিদ্যা-বিশারদরা একটা অভিনব ব্যবস্থা ঠিক করেছিলেন।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর পাশে একজন কোরে পদাতিক। ডান-হাতে গুলিভরা রাইফেল, বাঁ-হাতে প্রাণপণে ঘোড়ার জিনটাকে আঁকরে ধরে আছি; বাঁ-পাটা অশ্বারোহীর পায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে একসঙ্গে রেকাবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ডান-পাটা মাঝে মাঝে মাটীতে ফেলে উদ্দাম গতিতে চলেছি ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে।

বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ভাবতে পারেন আমার ভয় কোরছিল কিনা ! মোটেই না। মনে হচ্ছিল সে যেন

একটা পরম মহোৎসবের রাত্রি। মহোৎসবের রাতই বটে। আমাদের Storm Lancersদের হাতে ছত্রভঙ্গ হবার অপেক্ষা না রেখে জার্ম্মাণ সৈন্যদল পাল্টা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আস্‌চে। পিছনে সারি সারি কামান শ্রেণী তাদের অগ্রগতিকে বাধামুক্ত কোরবার জন্য (Technical Language : Cover) অবিশ্রান্ত অনল আর গোলা উদ্গিরণ করছে। হাউইট্‌জার কামানের ধমকানি, আট ইঞ্চি ক্ষেতিকামানের রেলের বাঁশীর মত শীষ্‌ দেওয়া শব্দ, মেসিন গানের কড়-কড়-কড় বজ্র ধ্বনি, সব মিলে এমন উন্মাদনাকর একটা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি কোরছে—যার আর কোন তুলনাই দেওয়া যায় না।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিষ হচ্ছে আলো। আকাশে যেন কারা হাজার হাজার মশাল বাজি খেলছে। কাতারে কাতারে লাল গোলা আকাশের বুক ভেদ কোরে বিদ্যুতের মতো ছুটে আসছে, কেবল আলো আর আলো, লাল আলো।

আকাশ থেকে জেপলীনের সার্চ্চলাইট পড়েছে, এবার আবার সাদা আলো। আকাশ থেকে একটা বিরাট বোমা পড়ে অতলস্পর্শী একটা কুঁয়ার মত গর্ত্ত হয়ে গেল। অগ্রগামী এম্বুলেন্স-বাহিনী, নার্স-বাহিনী আর কুলী-বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হোল—"পালাও, পালাও, পেছনে হঠো"—কিন্তু কেউ নড়ে না, আকাশের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রঙ্গের খেলা দেখ্‌চে। চোখে তাদের আলোর নেশা লেগেছিল বোধ হয়, পিঠে চাবুক পড়তে কুলী-বাহিনী কতকগুলি উন্মত্ত জনোয়ারের মত পিছন দিকে ছুটতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্স আর নার্স-বাহিনী। জার্ম্মাণ সৈন্যদল আর একশো হাত দূরেও আছে কি-না সন্দেহ। উপর থেকে আবার সার্চ্চলাইট পড়লো, কী উজ্জ্বল সাদা আলোক! ঘাসের ফাঁকে একটা স্ঁচ্‌ পড়লেও বোধ হয় দেখা যেতো। আবার

বোমা পড়লো—খুব নিকটেই। ধূলায় লুটান দেহগুলির দিকে চেয়ে মনে শঙ্কা জাগালো, তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে ফেলার ইচ্ছা হোল।

জিনের নীচেকার বেল্টের মধ্যে কনুই ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থাতেই চিঠিখানা খুলে ফেললাম। লেখা আছে, আমার একটী ছেলে হয়েছে—দেখতে নাকি খুবই সুন্দর। তার নিজের শরীরও ভাল আছে; সঙ্গে সঙ্গে কাতর অনুরোধ, একবার ছুটী নিয়ে এসে ছেলেকে দেখে যাও। চিঠিখানা হাতেই ছিল, মনে মনে ভাবছিলাম অবোধ পল্লীবালা, সৈন্য জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ও অনুশাসনের খবর তো আর সে রাখে না: সমস্ত শব্দ কোলাহল ভেদ কোরে লাউড স্পীকারের আদেশ এল "চার্জ্জ, চার্জ্জ", সঙ্গে সঙ্গে একজন তাজা মানুষের বুকের ভেতর বন্দুকের সঙ্গীন চেপে ধরলাম প্রাণপণে, তারপর আরেক জনের, আবার আরেকজনের······

হ্যাঁ, সেই যুদ্ধে আমরাই জিতেছিলাম। চিঠিখানা দেখি হাত থেকে খসে পড়েনি, আরেকবার পড়তে গিয়ে দেখি সব রক্তমাখা, কিছুই পড়া যায় না। সমস্ত মনের ভিতরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক ভাবে দুলে উঠলো। আমার এমন এই আনন্দের দিনে একি করলাম! শিক্ষিত দেশ-প্রেমিকেরা বুঝিয়েছেন যে যুদ্ধে মানুষ মারলে "পুণ্য" হয়, কিন্তু নিজকে সে কথা ঠিক ঠিক বোঝাতে পারলাম না, মূর্খ চাষা বলেই হয়তো!

যুদ্ধ চলতে থাকে। বৃদ্ধা পিসীমা মারা গেছেন, বাড়ী থেকে কেবল ফিরে যাবার অনুরোধ আসে, দাঁতে দাঁত চেপে সহস্র সহস্র সৈন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে থাকি।

অনেক সময় হতাশ হোয়ে পড়েছি, এ যুদ্ধ বুঝি আর শেষ হবে না, সেও থামলো, কিন্তু আমাদের চলার বিরাম নেই। মহাযুদ্ধে

নাকি আমাদের সৈন্যদল অশেষ বীরত্ব দেখিয়েছিল; হোয়াইট হল আর ওয়ার অফিসের আরাম কেদারায় বসা দেশপ্রেমিকরা আমাদের এই বীরত্বে বিশেষ মুগ্ধ হোয়েছিলেন, তাই আমাদিগকে দেশে ফিরিয়ে না নিয়ে তুর্কীর রণাঙ্গণে প্রেরণ করলেন।

তুর্কীর সেই দুরন্ত প্রাণঘাতী শীত। কালো পোষাক পরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে একা পাহারা দিচ্ছি। টুপী আর পোষাক বেয়ে অনবরত বরফ পড়ছে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ার মতো, আড়ষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পকেট থেকে ভ্যাসেলীন্ বের করে মুখে মাখ্‌ছি বার বার, কিন্তু পকেটের চিঠিখানার কথা ভুলতে পারছি না, "মা মারা গেছেন, আমি আর একা থাকতে পারছি না, যেমন করে পারো দেশে ফিরে এসো।"

অভিশপ্ত সৈন্যদল! তুর্কী-যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসবার হুকুম হোল, সাম্রাজ্য রক্ষার পূণ্যটা তো কাউকে না কাউকে সঞ্চয় করতেই হবে, যত বাছা সৈন্যদল হয় ততই ভাল। সুয়েজখাল দিয়ে জাহাজ চলার সময় আমরা সকলে উত্তর-পশ্চিম আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, কিন্তু কামানের ধোঁয়া আর মানুষের রক্তে স্মৃতি-শক্তি অনেকটা ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌চে, স্নেহ মমতার বন্ধনও অনেকটা আল্‌গা হোয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে আসার পর থেকে চিঠিও আসে না, ফিরে যাবার অনুরোধও আসে না। এই অসহ্য নীরবতা আমাকে অনিশ্চিত আশঙ্কায় অধীর করে তুলতে লাগলো। আমার একমাত্র চিন্তা হোল কি করে মুক্তি পাওয়া যায়।

কি করে মুক্তি পাওয়া যায়? দিন রাত কেবল উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলাম। সামরিক নিয়ম কানুনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

ঘাটতে লাগলাম; একদিন আবিষ্কার করলাম, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ সমস্ত দাগী চোরদের উপযুক্ত দণ্ডভোগের পর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

তিনবার চুরি করেছে এমন লোককেই দাগী চোর বলে গণ্য করা হবে।

এখন বোধ হয় বুঝেছেন যে দাগী চোরের কলঙ্ক আমি মাথায় নিয়েছি কিসের তাড়নায়। এর আগের দু'বার ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা মনে কোরে ওরা আমায় ক্ষমা করেছিল কিন্তু এবার আমাকে নির্ম্মমভাবে অপমান করে জীবন-পণ-করা যুদ্ধের মেডেলগুলি পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে! মানুষ খুন করে যে পুরস্কার আমি পেয়েছিলাম সেগুলির মোহ যদিও আমার নেই, এই মেডেলগুলি দেখবার জন্যও আমার স্ত্রী বড় উদগ্রীব হয়েছিল! মুর্খ গ্রাম্য রমণী কিনা, প্রতিবেশীদের কাছে এগুলি দেখিয়ে বোধ হয় একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো। ও যদি এখনও বেঁচে থাকে, এই মেডেলগুলির কথা জিজ্ঞেস করলে আমি কি জবাব দেবো? তা ছাড়া চুরি করাকে সে এমনভাবে ঘৃণা করে······

জেলের কম্বল মাথায় দিয়ে প্রাইভেট স্মিথ সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখছিল।

সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে ক্লান্ত চরণে দাঁড়িয়ে সে যেন জঙ্গলে আর আগাছায় ঢাকা অতি জীর্ণ একটা বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ছে। দরজাটাকে সামান্য একটু ফাঁক করে অর্দ্ধ-পরিচিতা ছিন্ন বসনা এক রমণী কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো "কে তুমি, কি চাই?"

"আমি একজন সৈনিক, দশ বৎসর আগে তোমাকে না বলে তোমার এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

রমণী তার আপাদ মস্তক খুব ভাল করে দেখে নিল—"সৈনিক তোমার সেই বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ মেডেলগুলি কই ?"

স্মিথ মাটীর দিকে চেয়ে জবাব দিল—"যারা দিয়েছিল, তারাই কেড়ে নিয়েছে।"

"কেন ?"

গলা দিয়ে কেন জানিনা আওয়াজ বের হচ্ছিল না, অতিকষ্টে বললো—"চুরি করেছিলাম তাই"।

সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণীর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মুখখানার প্রত্যেকটী মাংসপেশী ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে অতি বীভৎস রূপ ধারণ করলো। স্মিথ পরক্ষণেই দেখলো যে দরজাটা তার মুখের ওপরেই বন্ধ হোয়ে গেছে।

সে প্রাণপণে চীৎকার কোরে জিজ্ঞেস্ করলো "আমার ছেলে কই ?"

আর্ত্তকণ্ঠে জবাব এলো—"নির্ম্মম পিতার জন্য সে বসে নেই, সে মরে গেছে।"

আবার সে স্বপ্ন দেখলো।

আবার সে ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে ফিরে গেছে, তাজা মানুষের বুকের ভেতর বেয়নেট ঢুকিয়ে দিতে এবার আর একটুও অনুকম্পা হচ্ছে না।

একটী স্পেন দেশীয় গল্প

১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী।

মাদ্রিদ সহরের কোন একটী অখ্যাত পল্লী। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে অতি সন্তর্পণে লুকোনো গভর্ণমেণ্ট পক্ষের এরোপ্লেন-গুলির সব চেয়ে বড়ো আস্তানা। আস্তানার পাশে অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ একটী মেস। সমস্ত দিন অক্লান্ত বিমান চালনার পর চার জন দুৰ্দ্ধৰ্ষ বিমান যোদ্ধা একই সময়ে এসে খাবার টেবিলে মিলিত হয়েছিল। তিনজন স্পেনীয়, অপর জন রুশীয়ান।

রুশ বৈমানিক ভ্যাসিলভের বয়স খুব অল্প। পৃথিবীর সর্ব্বহারাদের প্রতি গভীর মমত্ব বোধই তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল শান্তিপূর্ণ ডন্ নদীর পার থেকে একেবারে স্পেনের রণাঙ্গণে! পিয়াজা ও পাদ্রে এই দু'জন প্রধান লেফ্টনাণ্ট বার্সিলোনা থেকে নতুন এসেছে বদলী হোয়ে— গভর্ণমেণ্ট তরফের জয়ের জন্য এরা কোরেছে মৃত্যুপণ।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সের পক্ক-কেশ অফিসারটির নাম ক্যাপ্টেন রডোলফো রোবল্স্। সমস্ত দেহে তার অসংখ্য ক্ষত-চিহ্ন—অনেকগুলিই প্রায় নতুন, গভীর সমাজতন্ত্রপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ সদ্যপ্রাপ্ত।

জন্ম তার এণ্ডুলেসিয়ার অন্তর্গত সেভিলে। বাল্যকালে মাতৃ-পিতৃ-হীন হবার পর বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝখান দিয়ে যাবার ঝক্কিতে অল্প বয়সেই তার চুলে পাক ধরেছিল। যোদ্ধৃ মহলে রোবল্সের খ্যাতি ছিল যে তার হাতের গোলাগুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু রোবল্স্ হচ্ছে প্রকৃত সাম্যবাদী, যুদ্ধে তার কিছুমাত্র আনন্দ নেই—মানুষ মারার ব্যবসাকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। তবে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কঠিন প্রয়োজনের সময় তার মত নির্ম্মম হত্যাকারীর তুলনা মেলা ভার।

সেদিন সে তার নিজের ও স্পেনের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা মৃদু হাস্য ও শ্লেষ সহকারে নবীন আগন্তুক ভ্যাসিলভের কাছে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ কোরছিল।

১৯৩২ সালের কথা। জেনারেল সান্‌জুরোর চক্রান্তে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবের চেষ্টা হচ্ছে। তখনকার বিমান বাহিনীর কমাণ্ডেণ্ট ফিলিপ অ্যাসিডো যে সভায় এই বিপ্লবে সৈনিকদের উত্তেজিত কোরবার চেষ্টায় ছিল সেখানে রোবল্‌স্‌ও উপস্থিত। বক্তৃতার বিষয়বস্তু কতকটা পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোবল্‌সের ক্ষিপ্র এবং অব্যর্থ রিভলবারের গুলিতে ফিলিপ ও অন্য সব চক্রান্তকারীই প্রাণ হারালো। অবশ্য প্রতিক্রীয়াশীল কোর্টমার্শালের জজেরা বক্তৃতা বিষয়টার গুরুত্ব না বুঝ্‌বার দরুণ রোবল্‌সের হ'ল ছয় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। বস্তুতঃপক্ষে ঐতিহাসিকরাও মনে করেন যে স্পেন গভর্ণমেণ্ট তরফে রোবল্‌সের মত আরও কয়েকজন বেপরোয়া ও ক্ষিপ্র কর্ম্মী থাকলে স্পেনের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসই বোধ হয় হোত সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

'৩২ সালের ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবে জার্ম্মানী কিংবা ইটালীর কোন হাত ছিল না সুতরাং শুধু একমাত্র রোবল্‌সের ক্ষিপ্রকারিতা ও সাহসের জন্যই চক্রান্তের গতি গেল ফিরে। পর্ত্তুগালের পথে পালাবার সময় ধরা পড়বার পর মাদ্রিদের সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সান্‌জুরোকে দণ্ডিত করা হয় চরম দণ্ডে। কিন্তু রিপাব্লিকান্ গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত দয়াতে তার শুধু প্রাণ রক্ষাই হোল না, কিছুদিন পরে মুক্তিও সে পেল।

মুক্ত হোয়েই সান্‌জুরো গেল পর্ত্তুগালে, সেখান থেকে গেল জার্ম্মানীতে হিটলারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কোরতে।

ফ্রাঙ্কো ও জেনারেল গডেড যে সান্‌জুরোরই অনুচর ছিল একথাও গভর্ণমেণ্ট জানতে পেরেছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁদের

দয়ার নীতির অন্যথা হোল না, ফ্রাঙ্কোকে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে এবং গড্ডেকে মেলকাতে বদলী কোরেই গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হোলেন।

তারপর যে কি হোল ইতিহাসের তাও অজনা নয়। গভর্ণমেণ্টের দয়ার দুর্ব্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই তিনটি ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবের ধুরন্ধর নিজেদের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ কোরবার জন্য গোপনে গোপনে ইটালী ও জার্ম্মানীর কাছে স্পেনকে বন্ধক রেখে প্রকাশ্য ফ্যাসিষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলো।

গভর্ণমেণ্ট যখন নিজেদের দুর্ব্বল নীতির ভুল বুঝতে পারলেন তখন আর সময় নেই। সান্‌জুরোর পতন হোল অপ্রত্যাশিত রকমে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ কোরবার জন্য পর্ত্তুগাল থেকে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সান্‌জুরো মারা গেল এরোপ্লেন দুর্ঘটনায়। এবার জেনারেল গড্ডের পালা। কিন্তু বিদ্রোহের নেতা স্বরূপে তার নাম প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার কোরে প্রাণদণ্ড দিতে গভর্ণমেণ্ট এবার আর ইতঃস্তত কোরলেন না। এবার নেহাৎ অদৃষ্টের জোরেই ফ্রাঙ্কো গ্রেপ্তার এড়িয়ে নেতৃত্বের পদে কায়েমী হোয়ে বোসলো।

রোবলস্‌ বলছিল "তোমাদের রাশিয়ার গণতন্ত্রের শত্রুদের প্রতি চরম দণ্ড দানের বিষয় নিয়ে এখানকার অনেক কমরেডদের মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু আমি আজকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হোয়েছি যে, একটা গোটা দেশশুদ্ধ লোকের সম্ভ্রম, নিরাপত্তা ও জীবনরক্ষা কোরতে হোলে সময় বিশেষে নির্ম্মম ও দ্বিধাহীন হবার প্রয়োজনই সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। বস্তুতঃ দয়া এবং কর্ত্তব্যকে দুটি বিভিন্ন পকেটে না রাখলে গণতন্ত্রের পক্ষে আত্ম-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি স্পেনের এই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তের পর অনেকেরই চোখ খুলবে।"

একটী স্পেন দেশীয় গল্প

স্বভাব-গম্ভীর রোবলস্ একসঙ্গে এত কথা কোন দিনই বোলত না। কিন্তু আজ তার মনের মধ্যে যে প্রবল ঝড় ক্রমাগত তাকে উতলা কোরে তুলছিল, বাইরের মুখের কথায় পাওয়া যাচ্ছিল তারই অভিব্যক্তি। কারণ আজ তার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার দিন।

রোবলসের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তার একটী মাত্র ভাই-ই তখন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বাপ-মা হারাবার পর রোবলস্ তাকে অন্তরের সমস্ত স্নেহ নিঃশেষ কোরে মানুষ কোরেছে। জব এখন চব্বিশ বছরের সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক।

রোবলস্ জানতো যে দেশ রক্ষার জন্য সুগঠিত এরোপ্লেন-বাহিনী ও নৌবহরের প্রয়োজন খুব বেশী, তাই নিজে বিমান চালনা শিক্ষা কোরলো খুব অধ্যবসায়ের সহিত এবং জবের লেখাপড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নৌ-বিভাগে কার্য্য নেবার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়ে দিল। জবও তার দাদার আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাই মাত্র তেইশ বছর বয়সেই নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় "সেণ্ট ম্যারিয়া" নামক যুদ্ধ জাহাজের সহকারী ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হোতে সমর্থ হোয়েছিল। রোবলস্ নিজের সাফল্যের চেয়ে তার ভাইয়ের এই সৌভাগ্যের গৌরবে নিজকে বেশী গৌরবান্বিত মনে কোরতো। সুতরাং গত বৎসর প্রায় এমনি সময় যখন খবর এলো যে দক্ষিণ উপকূলের যুদ্ধে "সেণ্ট ম্যারিয়ার" সঙ্গে জবও শত্রু হস্তে পতিত হয়েছে, তখন কিছুদিন পর্য্যন্ত রোবলসের অবস্থা রইল ঠিক আধপাগলের মতো। তারপর কিছুদিন পরে যখন খবর পাওয়া গেল যে জবের মত নিপুণ জাহাজ চালককে ওরা প্রাণে না মেরে তাকে তার পূর্ব্ব পদে বহাল রেখেই জোর করে ফ্যাসিষ্ট পক্ষে যুদ্ধ করাচ্ছে, রোবলস্ আবার জবকে উদ্ধার করার আশায় আশান্বিত হোয়ে উঠলো। এই এক বৎসরের মধ্যে এমন একটী দিনও যায়নি

যেদিন সে তার কমরেডের সঙ্গে জবের উদ্ধারের বিষয় নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা না কোরেছে। "সেণ্ট ম্যারিয়ার" সামান্য মাত্র নড়া চড়ার খবরও রোবলসের একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। একদিন আগে সংবাদ এসেছিল যে ফ্রাঙ্কোর অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে "সেণ্ট ম্যারিয়াও" বিলবাও উপকূলের দিকে রওনা হয়েছে।

কিন্তু আজকে যখন রোবলসের সঙ্গে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসের অঙ্গ স্বরূপ সামরিক উচ্চ-পরিষদ থেকে আদেশ এল যে শত্রুপক্ষের বিলবাও উপকূলের সমস্ত যুদ্ধ জাহাজগুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস কোরবার ভার রোবলসের ওপরই ন্যস্ত করা হোল, তখন তার বাইরের যোদ্ধৃ-সুলভ কঠিন ও অবিকৃত আবরণ দেখে তার কমরেডদের মধ্যে কেউই ধারণা করতে পারেনি যে কি কঠিনতম কার্য্যের দায়িত্ব পালন করতে সে আদিষ্ট হোয়েছে। আজ সে মনের আবেগে কর্ত্তব্যের পায়ে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষকে বলি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল সে কথা সত্যি কিন্তু তারপর তার মুখ থেকে একটী কাতরোক্তি কেউ আদৌ শুন্‌তে পায়নি।

"সেণ্ট ম্যারিয়া" যে বিলবাওয়ের জাহাজ-বাহিনীর অন্তর্গত, এবং "সেণ্ট ম্যারিয়া" ধ্বংস করার অর্থ রোবলসের কাছে যে ঠিক কি, এসব কথা ভ্যাসিলভ্, পিয়াজা ও পাদ্রে এ তিন জনই খুব ভাল কোরে জানতো। তাই যখন খাওয়া দাওয়ার শেষে রোবলস্ তাদের কাছে বিলবাও নৌ-বাহিনী ধ্বংস কোরবার প্ল্যান্ ও ইনষ্ট্রাক্‌শনগুলি নিতান্ত শান্ত ও সংযত ভাষায় বিবৃত কোরে যেতে লাগলো, তারা শুধু গভীর শ্রদ্ধাবনত ও বিস্ময়াবিষ্ট মনে রোবলসের মুখের দিকে রইলো তাকিয়ে, কোন রকম মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করবার কথা চিত্তে স্থান দিতে পারলো না।

*　　　　*　　　　*　　　　*

যাত্রার পূর্ব্বে অপর তিন জন বিমান যোদ্ধা গেছে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে। রোবলস্ ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে খাওয়ার টেবিলে অসার ও নিঃস্পন্দ ভাবে। যেতে হবে অনেকদূর, বাইরে এরোপ্লেনের ঘরগুলি থেকে ব্যস্ততার আওয়াজ আসছে, ইঞ্জিনীয়াররা কলকব্জা পরীক্ষা করে দিচ্ছে, আবশ্যকীয় পেট্রোলও চাই। রোবলস্ কিন্তু সাময়িক ভাবে এসব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, বেদনাতুর মন তার ঘুরে বেড়াচ্ছে অতীতের রাজ্যে। জব যেদিন পিতামাতার বক্ষ-চ্যুত হোয়ে রোবলসের জীবনকে আঁকড়ে ধরলো একান্ত নির্ভর ভাবে তখন থেকে তার গ্রেপ্তারের সময় পর্য্যন্ত যা কিছু খুটিনাটি ঘটনা জড়িয়ে আছে দুজনকার শ্রদ্ধা, মমতা ও স্নেহের আবেষ্টনীতে, সব কিছু যেন শুধু তাকে পীড়ন কোরবার জন্যই ভেসে আসছিল অতীতের স্মৃতি-রাজ্য বয়ে। তার কঠিন ও কর্ম্মভারাক্রান্ত জীবনে কোন নারী হৃদয়ের কোমলতা তাকে তেমন ভাবে স্পর্শ কোরতে সক্ষম হয়নি, তাই তার নিজেরই অলক্ষ্যে, তার নিজের ব্যক্তিগত উচ্চ অভিলাষ সরল রেখায় পদক্ষেপ কোরবার সঙ্গে সঙ্গে, শুধু জবকে কেন্দ্র কোরেই সে তার ভবিষ্যতের আশা ভরষাকে রূপ দিতে সুরু কোরেছিল কল্পনাতে। কিন্তু আজকে সব শেষ, তার নিজের প্রাণের গড়া প্রিয় স্বপ্ন-সৌধকে কর্ত্তব্যের কঠিন পদাঘাতে চূর্ণ কোরবার দায়িত্ব রোবলসকেই গ্রহণ কোরতে হোয়েছে, এবং এ বিষয়ে আর কালক্ষেপ কোরলেও আপাতঃ জয়যুক্ত জনগণের ভাগ্যের চাকা উল্টো পথে ঘুরতে সুরু করবে অবশ্যম্ভাবী ভাবে। চারদিকের ব্যস্ত পদ-শব্দে তার সম্বিত ফিরে এলো, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার মোহ গেল কেটে। ইঞ্জিনীয়ার এসে খবর দিয়ে গেল, সব প্রস্তুত।

*　　　*　　　*　　　*

উপকূলের যুদ্ধ-জাহাজগুলির গোলাতে বিলবাওয়ের বাড়ীঘরগুলি সব ভেঙ্গে চূরমার হচ্ছিলো, আর সেই ধ্বংসস্তূপগুলির মাঝখান থেকে ভেসে উঠ্‌ছিল নৈশ-গগন বিদারী আর্ত্তনাদ। তবু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই ভীষণ রাত্রে শত্রু-পক্ষের বোমারু বিমাণের সারা পাওয়া যাচ্ছিল না।

রোবলসের দল বিলবাও উপকূলের ঊর্দ্ধে এসে হাজির হোলো সূর্য্যোদয় হবার বহু পূর্ব্বেই। আকাশের গায়ে একটী চার কোণা ব্যূহ রচনা করা হয়েছে, সামনে রোবলস্, পিয়াজা ও পাদ্রে ডাইনে এবং বাঁয়ে, পেছনে ভ্যাসিলভ্।

ক্যাপ্‌টেন রোবলসের ইঙ্গিতে, পিয়াজা ও পাদ্রে ডুব দিল নীচের দিকে জাহাজগুলির উপরকার কামানের শিখা লক্ষ্য করে। নীচ থেকে পিয়াজা সঙ্কেতে খবর পাঠালো—"জাহাজ ছিলো সব শুদ্ধ চারটি, পাদ্রে একটীর ওপর সোজাসুজি গিয়ে পড়াতে সেটি ডুবেছে পাদ্রেকে নিয়েই, ওরা তীরের আক্রমণ থামিয়ে বিমাণ-বিধ্বংসী-কামান দাগ্‌তে সুরু কোরেছে, সাবধান।" পিয়াজার কাছ থেকেও এই-ই শেষ সংবাদ, রোবলস্ বারবার সঙ্কেত কোরেও কোন প্রত্যুত্তর পেল না। সে আর ভ্যাসিলভ্ নীচের দিকে নাবতে সুরু কোরলো।

ধোঁয়ার অন্ধকার এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আকাশ তখন ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসচে। পিয়াজা ও পাদ্রের এরোপ্লেনের কোথাও চিহ্নমাত্র নেই। লক্ষ্য স্থির কোরবার জন্য তারা আরো নীচে নেবে গেল একেবারে কামানের পাল্লার মধ্যে।

তারপর আরম্ভ হোল এরোপ্লেন আর যুদ্ধ-জাহাজের জীবন-মরণ যুদ্ধ। কিন্তু অজেয় রোবলস্ এবারও বিজয়ী হোল। শেষ দুখানা

জাহাজ ডুবছিল কাত হয়ে; তারা দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য কোরলো,—একখানার নাম "সেণ্ট ম্যারিয়া"। রোবলসে্র যেন একবার মনে হোল, সে জবেরই চীৎকার শুনতে পাচ্ছে। আরও প্রবল ভাবে সে বোমা বর্ষণ করতে সুরু কোরলো; মনকে সে প্রবোধ দিল, "জব আমার আর্ত্তনাদ কোরবার মত দুর্ব্বলচিত্ত ছেলেই নয়।"

প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিলবাওয়ের উপকূল সেবারকার মতো বিপদ-মুক্ত হোল।

*　　*　　*　　*

রোবলস্ ম্যাড্রিদে ফিরে এলো ঠিক যেন স্বপ্ন চালিতের মতো। আনন্দ ও প্রশংসাধ্বনির মাঝখানে ভ্যাসিলভ্‌কে সঙ্গে করে সে হেড কোয়ার্টসে গেল রিপোর্ট দাখিল কোরতে।

কিন্তু কমাণ্ডেণ্ট যখন জানালেন যে ভ্যাসিলভ্‌কে ক্যাপ্‌টেন ও রোবলস্‌কে মেজরের পদে উন্নীত করা হোল, রোবলস্ তখন মনে মনে ভাবছে—"কার এরোপ্লেনের বোমায় তারা প্রাণ হারালো জব কি তা অনুমাণ করতে পেরেছিল ?"

সুতরাং উত্তরে কমাণ্ডেণ্টকে চিরাচরিত প্রথায় ধন্যবাদ জানাবার কথা তার মনে এলো না।

যেদিন জ্বলবে আলো

শীতের রাত। ভাঙ্গা হারমোনিয়ামটার ওপর উপুড় হোয়ে বুঝিবা সে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। জোরে একটা শব্দ কোরে আধখোলা দরজার পাট দুটো দেয়ালের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা কিছু মাটীতে পড়ার শব্দ আর একটা চাপা আর্ত্তনাদ, "মা, মা, মাগো..."

রংমালা ধড়মড় কোরে উঠে বসলো।

"কে ডাকে, কে-ও ?"

আর কোন সাড়া এলো না। চারিদিকে গ্রামের নৈশ-নিস্তব্ধতা, খোলা দরজাটা দিয়ে শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছে।

বুকের ভেতরটা তখন তার ভয়ানক টিপ্‌ টিপ্‌ কোরছে। ত্বরিতে খাটের ওপর থেকে নেমে, পেরেকে ঝোলানো লণ্ঠনটা এনে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে দেখলো, আড়াআড়িভাবে চৌকাটের ওপর একটী নাতি-ক্ষুদ্র মনুষ্যদেহ আধাকাত আধা-উপুড় হোয়ে পড়ে আছে। পিঠের এক পাশে অর্দ্ধেকটা বসানো একটা ছোরা লণ্ঠনের আলো পড়ে চক্‌মক্‌ কোরে উঠলো। রংমালা বোধ হয় স্বতঃই একটা চীৎকার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোলো না। বাতিটা আরও কাছে নিয়ে ভাল কোরে দেখলো, নেহাৎ অল্প-বয়স্ক একটী ছেলে, রুক্ষ ধূলি-ধূসরিত চুল, শীর্ণ মলিন দেহ, মলিন তার বেশ। একেবারে নিঃসাড় নিস্পন্দ, নাকে হাত দিয়ে দেখলো শুধু অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়ছে। অতি সন্তর্পণে তাকে ঘরের ভেতর টেনে এনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বাইরে চলে গেলে। কতক্ষণ পরে রংমালা ফিরে এল কতগুলি কচি গাঁদা পাতা নিয়ে। সেইগুলি ভাল কোরে চিবিয়ে চিবিয়ে থেঁৎলে ফেললো। ছোরাটা আস্তে আস্তে টেনে উঠিয়ে ফেলে গাঁদাপাতাগুলি ক্ষতটার মধ্যে

দিয়ে শক্ত একটা নেকড়া দিয়ে ভাল কোরে বাঁধলো। যতক্ষণ রক্তটা বন্ধ না হোল ততক্ষণ অপেক্ষা কোরলো, তারপর তাকে পাঁজাকোলা কোরে বিছানার ওপর নিয়ে ভাল কোরে ঢেকে-ঢুকে শুইয়ে দিল।

পরদিন অনেক বেলায় সমস্ত গায়ে বেদনা নিয়ে মনির যখন ঘুম ভাঙ্গলো, রংমালার তখন স্নান পর্যান্ত শেষ হয়ে গেছে। ছোরার আঘাতটা তেমন কিছু মারাত্মক বলে তার মনে হয়নি, স্মরণ পড়লো মাথার ওপর লাঠির বাড়িটার জন্যই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দুপুর রাতে একবার তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, একবার মনে হয়েছিল একান্ত স্নেহভরে কে যেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর বেশী কিছু সে চিন্তা কোরতে পারেনি, গভীর অবসাদভরে তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চোখ মেলে চারিদিকটা সে একবার ভাল কোরে দেখলো। ছোট ঘরখানা। একখানা খাটেই প্রায় সবটা ভরে গেছে। আসবাব-পত্র আর কিছু খাটের ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য ঠাকুর দেবতার ছবি আর ক্যালেণ্ডার। সদ্য-স্নাত রংমালা তখন প্রসাধনে ব্যস্ত, চুল না পাকলেও বেশ বোঝা যায় যে তার বয়স অনেক হ'য়েছে। মনি তাকে দেখে প্রথমটা মোটেই প্রীত হোতে পারলো না। যেমন মোটা, তেমনি কালো। চেহারার মধ্যে বীভৎস ভাবটাই প্রকট, সামনে দাঁড়িয়ে যেন একটা মূর্ত্তিমতী দুঃস্বপ্ন।

মনির যে ঘুম ভেঙ্গেছে রংমালা তা প্রথমে জানতে পারেনি। ফিরে দেখে ও' তার দিকেই চেয়ে আছে। রংমালা মনির মাথার কাছে এগিয়ে এল।

"কেমন বোধ হচ্ছে আজকে ?"

"অনেকটা ভাল। আপনিই আমাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খাটে শুইয়েছেন ?"

"হ্যাঁ"

প্রথম দেখেই রংমালার প্রতি ওর যে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা এসেছিল, রংমালা যে ওর জীবন রক্ষা কোরেছে এই কথা জানবার পরেও সেটা গেল না। মনি কৃতজ্ঞতা অনুভব কোরলো, কিন্তু বিশেষ প্রীত হোতে পারলো না।

"বাড়ী কার?"

"বাড়ী কোথায়, এক খানাই ত মাত্র ঘর। তা······আমারই।"

"এখানে আর কে থাকে?"

"আর কেউ থাকে না এখানে।"

"ও" মনি চুপ কোরলো।

রংমালার অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, এবার সে ফুরসৎ পেল প্রশ্ন কোরবার।

"বিছানাটায় তোমার কোন কষ্ট হয়নি ত রাত্রে?"

"কষ্ট?—এই বিছানায়!" মনি আর কিছু বলতে পারলো না সহসা।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর কর্কশ একটা কম্বল গায় দিয়ে রাতের পর রাত যার কেটে যায়, তাকে যদি হঠাৎ একদিন রাত্রে একটা পালং, নরম লেপ আর বালিশ দিয়ে সকাল বেলা ভদ্রতা কোরে জিজ্ঞেস করা হয়, "কোন কষ্ট হয়নি ত রাত্রে?" তাহলে বাস্তবিকই তার জবাব দেবার বিশেষ কিছু থাকে না। এই সামান্য স্নেহ-সৌজন্যে মনি বাস্তবিকই এতটা মুগ্ধ হোল যে রংমালার প্রতি মূহুর্ত্ত-পূর্ব্বের পোষিত বিতৃষ্ণ ভাবটার আর একটুও অবশিষ্ট রইল না।

কিছুক্ষণ থেমে ধরা গলায় আবার সে জবাব দিল, "না একটুও না। তবে ব্যাথার ত একটা কষ্ট আছেই।"

"হ্যাঁ, তাত আছেই। তবে ঘা'টা তেমন ভয়ানক কিছু নয়। কোন ডাক্তারও লাগবে না। দু'চার দিনের মধ্যে আমিই ও ভাল করে দিতে পারবো।"

"'আসল চোটটা আমার মাথাতেই লেগেছিল। তবে ছোরাটাও এমন জায়গায় বসিয়েছে যে একটু নড়তে চড়তে গেলেই লাগে। রাত্রে-বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা খুলে আবার রংমালা নতুন কোরে সেটা বাঁধলো, তারপর বললো, "এসব ঘটনা এ অঞ্চলে মোটেই আশ্চর্য্যের কিছু নয়, তোমার মত ছেলেমানুষের ওপর কার এত আক্রোশ হোল বুঝতে পারছি না।"

"আমি ছেলে মানুষ নই।"

রংমালা হেসে ফেললো।

"আহা তা নয় নাই হলে, তবু জিজ্ঞেস কোরছি, বলবে আমায়?"

রংমালাকে বলতে মনির কিছুই আপত্তি নেই।

সে থাকে কোলকাতায়। মাত্র আগের দিন সকালে এসেছে শ্যামনগরে। উদ্দেশ্য তিন নম্বর পাটকলের লুপ্ত ইউনিয়ানটাকে পুনর্গঠন করা। ইউনিয়ন দিয়ে কি হয়, এবং সেটা যে সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত ব্যাপার, সে সব রংমালাকে ভাল কোরে বোঝাতে হোল প্রথমেই।

দেড়বছর আগে তিন নম্বর পাটকলে একটা বড় রকমের ধর্ম্মঘট হয়। তখন অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মনিও এসেছিল এখানে ইউনিয়নের তরফ থেকে কাজ কোরতে। ধর্ম্মঘটে যদিও শ্রমিকরাই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে, মিলের মালিকরা মহম্মদ নামে একজন বুড়ো কুলি-সর্দ্দারকে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে ভাড়াটে মজুর আনতে নিযুক্ত কোরেছিল। এই ব্যাপারে কোন অজ্ঞাত ধর্ম্মঘটী ক্ষেপে গিয়ে সর্দ্দার মহম্মদকে খুন করে।

মহম্মদ মরবার পর তাঁর ছেলে রফিক সর্দ্দার-পদে বহাল হয়। এই পদটা পেয়েই বাপের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হিসেবে সে প্রতিজ্ঞা করে যে "জান কবুল" তবু সে তিন নম্বর কলে আর কোন ইউনিয়ন গড়তে দেবে না। অনেকে অনেক চেষ্টা কোরেছে কিন্তু রফিকের ভয়ে বেশীদূর কেউ এগোতে পারেনি। সেও শ্যামনগরে পা দেওয়া মাত্র রফিক এসে তাকে শাসিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনি ভয় পাবার ছেলে মোটেই নয়।

মোটামুটি যদিও সে সাবধানেই ছিল, রাত্রের অন্ধকারে ঠিক তার কোলকাতা ফিরবার মুখে কারা যে তাকে লাঠি আর ছোরা দিয়ে আক্রমণ কোরলো মনি তার কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু তার মনে আছে যে এই বসতি-বিরল রাস্তাটার ওপর শুধু রংমালার দরজাটা খোলা পেয়ে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটতে থাকে এবং চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

সব কথা না জানলেও, ধর্ম্মঘট আর দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর সে আগেই রাখত। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনির সব কথা শুনে সে মন্তব্য কোরলো, "তা ভালই কোরেছিলে বাপু আমার ঘরে ঢুকে, আসে পাশের সব লোকই ত রফিকের হাতের মুঠোয়।"

"রফিককে আপনি চেনেন নাকি?"

"চিনি অল্প অল্প সর্দ্দার মহম্মদকে অবশ্য খুব ভাল কোরেই চিনতাম।"

তারপর মনির একটু অস্বস্তি ভাব লক্ষ্য কোরে বললো, "তা বলে তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে আমি রক্ষাই করবো। আমাকে তুমি পুরোপুরিভাবে বিশ্বেস কোরতে পার।" তাকে যে সে বিশ্বাস কোরতে পারে সে বিষয়ে অবশ্য মনিরও কোন সন্দেহ ছিল না।

চারদিনের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনি ঘোষণা কোরলে যে সেই দিনকার সন্ধ্যার বাসেই সে কোলকাতা যাবে। রংমালা প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল যে ঘা'টা একেবারে শুকোয়নি, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আবার চিড় খেতে পারে। বিশেষ কাজ আছে, সকলেই তার জন্য অপেক্ষা কোরে আছে, মনি একেবারে অধীর। অগত্যা রংমালাকে রাজী হোতে হোল। দুপুরবেলা খেতে বসতে গিয়ে থালার দিকে চেয়ে মনি একটু হাসলো, "বিশেষ ঠেকায় না পড়লে এত আদর যত্ন ফেলে সহজে কি আর কেউ যেতে চায়!" পরমুহূর্তেই তার মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

"আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন মার কাছ থেকে আমি শেষ বারের মত বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তিনি ঠিক এমনি কোরেই আমাকে পরম যত্নে খাইয়ে দিয়েছিলেন।"

রংমালার সম্বন্ধে মনি শুধু মাত্র একটা আন্দাজ কোরতে পারে, কিন্তু মনির সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ই রংমালা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে। সংসারে আপনার বলতে মনির শুধু ছিল এক মা। তিনিও কিছুকাল আগে মারা গেছেন। সে কোলকাতায় পাইস হোটেলে খায় এবং একটা শ্রমিক সংঘের অফিসে থাকে। খবরের কাগজ বিক্রী কোরে নিজের খরচ চালায়। ম্যাট্রিক পাশ কোরে কলেজের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু অর্থাভাবে আর এগোতে পারেনি।

তবে একটা বিষয়ে রংমালার প্রথম থেকেই একটা খটকা ছিল। "আচ্ছা, তোমরা যে সামান্য মজুরদের জন্য প্রাণপণ করো, মরতে পর্য্যন্ত রাজী আছো, এতে কি তোমরা টাকা পাও?"

"টাকা?" মনির খুব হাসি পেল, "হ্যাঁ, তা টাকা পাওয়ার সুযোগ দুএকটা মাঝে মাঝে আসে বৈকি; এই ত সেদিন লিলুয়ার

একটা মিলের ম্যানেজার আমাকে চুপি চুপি ডেকে বলেছিল যে তার পাশের মিলটায় মাস তিনেকের জন্য একটা ধর্ম্মঘট লাগিয়ে দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।”

“তা পেলে হাজার টাকা ?”

মনি আবার হাসলো।

“কেন, আমার চেহারাটা দেখে হাজার টাকার মালিক বলে মনে হয় নাকি ?”

“নিশ্চয়ই না” রংমালা এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে মনিরা কোন লাভের আশায় কিছু করে না।

“কিন্তু টাকা না পেলে এসব করো কেন ?”

“লোকে কি সব কিছুই টাকার জন্য করে ?”

“অন্ততঃ আমি ত সে-রকমই জানি।”

“একেবারেই ভুল জানেন। এই ধরুন না আপনি, আমার জন্য যে এত কোরলেন, বিপদ ঘাড়ে নিলেন, কিছু টাকা পয়সারও ক্ষতি কোরলেন, এ সবই কি টাকার লোভে ?”

রংমালার সামনে একটা নতুন জগত খুলে গেল। তার নিজের মধ্যেও যে মহত্বের সামান্য একটু কণিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকতে পারে তা সে এতদিন ধারণায়ও আনতে পারেনি। মনি প্রথম থেকেই তাকে “আপনি” সম্বোধন কোরে তার বহুদিনকার লুপ্ত আত্মচেতনাকে নাড়া দিয়েছে। এই নূতন আবিষ্কারে তার নিভৃত অন্তরে একটা নূতনতর আনন্দের অনুভূতি জাগলো।

তারপর মনি তাদের উদ্দেশ্য কি, এই সব আন্দোলনের ভেতর থেকে তারা কি চায়, খুব সহজ ভাষায় রংমালাকে সব কথা বুঝিয়ে দিল। রংমালাও সব কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে শুনলো, তারপর বললো,

"মজুরদের কথা না হয় হোল, কিন্তু আমাদের কি হবে ? আমাদের কি কোন কিছু আশা কোরবার পর্য্যন্ত নেই ?"

বাস্তবিক পক্ষে এদের কথা সে কোনদিন চিন্তাই করেনি এর আগে, তাই সহসা কোন উত্তর দিতে পারলো না। মনির এই ইতঃস্তত ভাবটা রংমালার চোখ এড়াল না।

"তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু তোমার বড়রা যাঁরা নাকি সমস্ত দুনিয়ার দুঃখীদের জন্যই চিন্তা করেন, তাঁরাও কি আমাদের কথা কিছু বলেন না ? তোমাদের দয়া পাবার যোগ্যও কি আমরা নই ?"

মনি আরও অনেকক্ষণ চুপ কোরে চিন্তা কোরলো। আস্তে আস্তে মনে পড়লো, বহুদিন আগে পড়া বাংলা মাসিকের একটা প্রবন্ধের কথা, রুশিয়ার অনুরূপ দুঃখিণীদের জন্য ১৯১৭ সালের স্থাপিত গভর্ণমেণ্ট কি কোরেছিলেন সে সম্বন্ধে লেখা ; মনির স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ফিরে এলো।

"তাঁরা বিশেষ কিছু না বললেও আমি জানি আমরা কি কোরবো। প্রথমেই এই ব্যবসাটাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে ঘোষণা কোরতে হবে। তারপর তাদের প্রত্যেককে একটা খুব বড় রকমের উপনিবেশ মত ঘেরাও যায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সেখানকার প্রথম কাজ হবে তাদের সকলকে আধুনিক পদ্ধতিতে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা করান ; দ্বিতীয় কাজ হবে কয়েকটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে তোলা ; তৃতীয়, সেখানে কয়েক রকম শিল্পের কারখানা খুলে সকলকে চার ঘণ্টা খাটিয়ে ভাল মাইনে দেওয়া। চার ঘণ্টা তারা খাটবে আর চার ঘণ্টা তারা পড়বে, এই থাকবে ব্যবস্থা। তারপর ছুটী, এই সময়টা থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখবে, একজন শিক্ষয়িত্রীর তদারকে বাইরে বেড়াতে যাবে, অথবা খেলাধূলো কোরবে। এমনি থাকতে হবে মাত্র তিন বছর, তার পর আবার মুক্ত, পূর্ব্বের ছাপ সব ধুয়ে মুছে আবার সমাজে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু আমরা যে পাপী, সমাজ কি আর আমাদের ফিরিয়ে নেবে ?"

"আরে, আপনি নেহাৎ সেকেলে দেখছি, পাপ আবার কি ?"

রংমালা একেবারে থ' হোয়ে গেল। এতবড় একটা গুরুতর কথা যে এমন ভাবে কেউ বলতে পারে তা তার কল্পনারও অতীত।

মনি আবার বললো, "অবশ্য সমাজ যাতে পাপের কুসংস্কার ভুলে গিয়ে এই সব নতুন মানুষদের আবার ফিরিয়ে নেয় তাদের মধ্যে, সে জন্য আমাদের যথেষ্ট প্রচার চালাতে হবে।"

"কিন্তু এসব হবে কবে ?"

উত্তরে সে যা বললো রংমালা তার কিছু বুঝলো কিন্তু বুঝলো না অনেক কিছু। তবে তার এটুকু ধারণা হোলো যে কোন একটা ভবিষ্যতের নির্দ্দিষ্ট দিন, যা নাকি মনির মত ছেলেরা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে আহরণ কোরবে, এসব হবে তার পরে। দেরী আছে, তা থাক, তবু আশা তো! রংমালা নিজেকে অনেকটা হালকা অনুভব করে।

মনির যাবার সময় রংমালাও একরকম জোর করেই তার সঙ্গে চললো বাস স্টেশন পর্য্যন্ত। কোথায় কোন আততায়ী লুকিয়ে আছে কে জানে, তবে রংমালা লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে থাকলে নাকি আর কিছু ভয় নেই। চলতে চলতে মনি জিজ্ঞেস কোরলো, "আচ্ছা, যদি পাপই মনে করেন, তবে এলেন কেন এ পথে ?"

"এসেছি কি আর বাছা সাধ কোরে ? আমরা ছিলাম খুব গরীব, দুবেলা দুমুঠো খেতেও পেতাম না। বাপের ঘর ছেড়েছিলাম প্রথম গওনার লোভে, এটা তারই শাস্তি।"

"গওনার লোভে ? তা পেয়েছেনও ত কম না।"

"ও, যা সব তুমি দেখেছ ? ওর কোনটাই সোণা নয়, সব ফাঁকি, শুধু লোক দেখাবার জন্য।"

সহানুভূতিতে দুই চোখ তার আর্দ্র হোয়ে এলো, অনেকক্ষণ সে আর কোন কথা বলতে পারলো না।

তাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে রংমালা বার বার কোরে বলে দিল, ঘাটা নিয়ে সে যেন বেশী নড়া চড়া না করে। আর তার থেকে কথা আদায় কোরলো, সে আবার এসে তার বাসাতেই উঠবে। মনি হাত তুলে প্রণাম কোরলো তাকে, বাস ছেড়ে দিল।

তারপর সে ক্ষুদ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিস্তব্ধ বনপথ ধরে একাকী শূন্য ঘরে ফিরে চললো। ছোট্ট লণ্ঠনটাতে পদক্ষেপের জায়গাটুকুর বেশী আলো হয় না, চারদিকের জমাট অন্ধকার ঠিক তার অন্ধকার ভবিষ্যতের মতই কালো। রংমালা ভাবছিল,

আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য !

এরা সব কোন জগতের মানুষ, যেথানে লোক ছেঁড়া মাদুরের ওপর রাত্রিবাস করে কিন্তু হাজার টাকার লোভে মুগ্ধ হয় না, অথচ পাপের কথা শুনলে বলে, কুসংস্কার ?

আর একটা কথাও তার মনে বার বারই তোলপাড় কোরছিল, মনি যখন সেদিন "মাগো" বলে চীৎকার কোরে তার চৌকাঠের ওপর এসে আছাড় খেয়ে পড়লো, সে অমন ধড়মড় কোরে জেগে বসেছিল কেন ?

জীবনে জেগেছিল মধু-মাস

রাত থাকতে গিয়ে ষ্টেশনে হাজির হোতে হবে এই চিন্তায় লোপেজের কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না। সাধারণতঃ তার ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হোতো। মামা প্রিম্‌ অনেকবার কোরে বোলে দিয়েছেন, ষ্টেশনে অবশ্য অবশ্য যেতে; ঠিক সময় যদি ঘুম না-ভাঙ্গে, এই চিন্তাটা লোপেজের মনে ক্রমেই প্রবল হোয়ে উঠছিল।

মামা প্রিম্‌ ছিলেন স্থানীয় স্পেন গভর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিসের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে জোভেলার ছিল অলস, অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন। পড়াশুনা শেষ কোরে অনেকদিন যাবৎ বাড়ীতেই ছিল, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কোরতে বোললে শুধু এখানে সেখানে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতো পরিশ্রান্ত হবার ভাণ ক'রে। মেয়ে ইসাবেলা মাদ্রিদে থেকে পড়তো, সম্প্রতি সে বাড়ী এসেছিল। ইসাবেলা ছিল ভীষণ বদ্‌ মেজাজী, রুক্ষ-ভাষী এবং একগুঁয়ে। তার যখন যা খুশী হোত তা' ক'রতোই। প্রিম্‌ ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন আশ্চর্য্য রকমের ভাল লোক। লোপেজ তাদের বহু দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, কিন্তু যখন তাঁরা লোপেজের বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পারলেন, তখনই প্রিম্‌ নিজে গিয়ে ভাগ্নেকে নিয়ে এসে কিছু দিনের চেষ্টায় ছোটখাট একটা হোটেলের ম্যানেজারী যোগার ক'রে দিলেন। ভাষায় বলতে গেলে লোপেজ দেখতে তেমন সুন্দর ছিল না, কিন্তু তার চমৎকার স্বাস্থ্য ও সুন্দর কথাবার্ত্তার জন্য লোকে খুব তাড়াতাড়ি তার প্রতি আকৃষ্ট হোতো। এদিকে সে লেখাপড়ায় যেমন ভাল ফল দেখিয়েছিল, কাজ-কর্ম্মেও ঠিক ছিল তেমনি চতুর।

প্রিম্ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, স্নেহ তাঁর অপাত্রে পড়েনি ; নিজের ছেলের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র উচ্চ ধারণা না থাকাতে লোপেজকে তিনি ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতে লাগলেন।

কিন্তু লোপেজ সম্বন্ধে একটা বিষয় তার মামা কোন দিনই জানতেন না। জানলে তিনি তাকে ঠিক কি রকম চোখে আবার দেখতে স্বরু কোরতেন নিশ্চয় কোরে কিছু বলা যায় না। প্রিমের সাম্যবাদ ভীতি বড় প্রবল ছিল ; কিন্তু লোপেজ বয়সে তরুণ হোলেও সাম্যবাদীদের মধ্যে সে ছিল একজন নেতৃ-স্থানীয়। দিন-রাতের মধ্যে যতটুকু সময় সে পেতো—গণ-জাগরণের চেষ্টায় সে ব্যাপৃত থাকতো।

এই সব কারণে এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জন্য বাড়ীতে এবং বাইরে সর্ব্বত্রই সকলে লোপেজকে খুব ভালবাসতো এবং বিশ্বাস কোরতো। প্রিম্ জানতেন, আর যাকেই তিনি ষ্টেশনে যাবার ভার দেন, হয় সে ঘুম থেকে অতো সকালে উঠতে পারবে না, নয় তো ভুলেই যাবে—এরকম সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে, কিন্তু লোপেজকে কাজের ভার দেওয়া মানে নিশ্চিন্ত হওয়া। অনেক রাতে যখন লোপেজের ঘুম এলো তখন এক সকালে ওঠা ছাড়া তার মনে আর কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর ওপর সে একটা ভাল ধারণা নিয়েই চোখ বুজলো।

ভয়ে ভয়ে সে যখন চোখ খুলে দেখলো, তখনও খানিকটা রাত আছে। ঘড়িটা তাড়াতাড়ি হাতে বেঁধে নিয়ে, ওভার কোটটা চাপিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটে চললো। সেভিল ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের এক প্রান্তে লোপেজ পা' দিয়েছে অমনি অপর প্রান্ত দিয়ে ট্রেনখানি এসে ঢুকলো। মনে মনে সে ভাবছিলো, "ভাগ্যিস্ দেরী হ'য়ে যায়

নি !” ট্রেণ থেকে লোক নাব্‌ছে, লোপেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলো। একটী বৃদ্ধের সঙ্গে দুটি তরুণী, নিশ্চয়ই এরা। লোপেজ সটান এগিয়ে গেল, “আপনারা কি ডন্‌জুয়ান প্রিমের বাড়ী যাবেন ?”

বৃদ্ধ যেন অকূলে কূল পেলেন—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না ?”

“ডন প্রিম্ আবার মামা, একটু দাঁড়ান দয়া ক’রে, আমি একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে আস্‌চি চট্ ক’রে।”

গাড়ীতে লোপেজ বোসলো বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধই কথা আরম্ভ কোরলেন—“তোমাদের এখানকার মেলা আরম্ভ হোতে আর তো মাত্র সাত দিন বাকী, কেমন ?” লোপেজ বুঝলো যে তা হোলে এরা সেভিলের বিখ্যাত মেলা দেখতেই এসেছে এখানে। সে বাড়ীর কোনও খবর রাখতে কখনও চেষ্টা কোরতো না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতো না কখনও। সকলের কথাবার্তার মারফৎ যতটুকু বুঝতে পারতো তাতেই বেশ সন্তুষ্ট থাকতো।

বৃদ্ধ আবার আরম্ভ কোরলেন—“আমার এই মেয়ে দুটী কোন দিন সহর দেখেনি, এই মেলাটা উপলক্ষ্য ক’রেই নিয়ে এলাম, তারপর তোমার মামা ওদের মেসোও আছেন এখানে।” লোপেজ মেয়ে দুটিকে এবার একটু ভাল ক’রে দেখলো, তারা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এবং খুব নির্লিপ্ত ভাবেই বসেছিল। লোপেজ একটু কৌতুক অনুভব ক’রে মনে মনে বললো, যতই না কেন গম্ভীর হ’য়ে বিজ্ঞতার ভাণ করো, তোমরা যে গ্রাম থেকে আস্‌ছো আর কিছুই জান না এবং বোঝ না, তা তোমাদের একবার মাত্র দেখলেই বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক কোরে ফেললো যে, এই মেয়ে দুটীর গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে কি আছে তা তাকে জানতেই হবে।

বড় মেয়েটীর নাম ইউজিন; ছোটটীর নাম ম্যারিয়া। প্রথম কয়েকদিন তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হোয়েছিলো। ইসাবেলা একে বড় সহরে থাকে—তায় অহঙ্কারী। ইউজিন আর ম্যারিয়াকে দেখে প্রথম থেকেই নাক সিটকোতে সুরু করলো। সে নিজেতো তাদের সঙ্গে মিশতোই না, এমন কি লোপেজ আর জোভেলারের ওপরেও সে কড়া আদেশ জারী কোরলো, ওদের সঙ্গে তারা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবে না। জোভেলার এ-সব বিষয়ে অনেকটা তার বোনেরই পুরুষ-সংস্করণ ছিল, সুতরাং তাকে নিয়ে ইসাবেলার কোন অসুবিধেয় পড়তে হোল না। লোপেজ কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলো। একে তো সে সাম্যবাদী মানুষ; ধোপা, মুচি, শ্রমিক সকলেই তার কমরেড্। কেবল মাত্র গ্রামাতার অপরাধে ইউজিন আর ম্যারিয়াকে সে তো দূরে রাখতে পারেই না, তার ওপর আবার তাদের দেখা মাত্রই সে তাদের মনের ভেতরটা জানবার জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা কোরে ব'সে আছে।

তরুণ-তরুণীদের মনের পক্ষে ১৮৯৭ সালের মাদ্রিদের আবহাওয়া ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর; তারপর ইসাবেলাও কোনদিন ভাল মেয়ে ব'লে পরিচিত হ'তে ব্যগ্র ছিল না। অনাবিল আনন্দের শ্রোতে গা ভাসিয়ে না দিলে কেউ স্যোসাইটি-লেডী খেতাব পেতে পারতো না। ইসাবেলা ছিল এমনি একজন স্যোসাইটি-লেডী। লোপেজ প্রথম দৃষ্টিতেই ইসাবেলার সুনজরে পড়ে গেল; এবং ইসাবেলা তাকে গভীর ভাবে 'ভালবাসতে' সুরু কোরলো। তার গায়ে পড়া ব্যবহারে লোপেজ যারপরনাই বিরক্তি অনুভব ক'রতো, সদাশয় মামার মনে কষ্ট দেবার আশঙ্কায় সে মুখে কিছু বোলতো না।

ইসাবেলা শুধু হুকুম জারী ক'রেই নিশ্চিন্ত ছিল না। লোপেজকে ইউজিন কিংবা ম্যারিয়ার সঙ্গে কথা বোলতে, এমন কি তাদের সঙ্গে

তাকে এক ঘরে দেখলেও ইসাবেলার এমনই চক্ষু-শূল হোত, লোপেজকে ওদের কাছ থেকে যতক্ষণ না দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো ততক্ষণ তার শান্তি ছিল না। অবশেষে মেলা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই ইসাবেলাকে মাদ্রিদের কলেজ-হোষ্টেলে ফিরে যেতে হোল। ইউজিনও তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল তার বিয়ের সব ঠিকঠাক হচ্ছে এই খবর পেয়ে। ঘটনাচক্রে শুধু ম্যারিয়াই রইলো সেভিলে।

এবার লোপেজের সঙ্গে ম্যারিয়ার ভাল ক'রে আলাপ হোল। একদিন সকালবেলা লোপেজ তার মামার বৈঠকখানায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, ম্যারিয়া তার হাতের বোনা নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চুপচাপ ব'সে ছিল; হঠাৎ ব'লে উঠলো "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ডন মোরেট্ কি বোলেছেন, দেখি, দেখি, ওল্টাও তো পাতাটা!" নিজের অতি-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে লোপেজের বেশ একটু গর্ব্ব ছিল; ম্যারিয়াও এত দূরের লেখা পড়তে পারে দেখে সে বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হোল,—"এত দূরের লেখা তুমি পড়তে পার নাকি?"

"হ্যাঁ, আরও অনেক দূরের লেখাও পারি।"

লোপেজ চেয়ার সরিয়ে নিয়ে আরও কিছুটা দূরে গিয়ে ব'সে বললো—"পড়তো এখন!"

"স্পেনের অস্ত্র-শক্তির অভাব, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্বন্ধে স্পেনের সম্পূর্ণ অসমর্থতা, ডন মোরেটের ভোটে পরাজয়, যুদ্ধ ঘোষণা।"

লোপেজ ম্যারিয়ার চোখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলো। অতি সুন্দর, ভাসা ভাসা সরল দুটী চোখ। ম্যারিয়াকে লোপেজের অত্যন্ত ভাল লাগতে আরম্ভ কোরলো, ওদের আলাপ আর বন্ধুত্বের এখন আর কেউ বাধা ছিল না। ইসাবেলার ব্যবহারে লোপেজ এবং ম্যারিয়া উভয়েই বেশী রকম অসন্তুষ্ট ছিল। একজন ইসাবেলার বিরুদ্ধে

কিছু মন্তব্য কোরলে, অপরজন তা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কোরতো। এই বিষয়টা ভিত্তি ক'রেই প্রথম তাদের বন্ধুত্ব ক্রমে পাকা হ'য়ে উঠলো।

ম্যারিয়ার বাবা ইতিমধ্যে ঠিক ক'রেছিলেন যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছুদিন তাকে খরচ দিয়ে সেভিলে রাখবেন। ম্যারিয়া সেভিলে থাকার ব্যাপার নিয়ে বিশদভাবে লোপেজের সঙ্গে পরামর্শ কোরলো। ঠিক হ'লো যে ম্যারিয়া দ্বিতীয়বার আর ইসাবেলার চক্ষু-শূল হোয়ে মাসীর বাসায় উঠবে না, কোন মেয়েদের মেস কিংবা হোষ্টেলে টাকা দিয়ে থাকবে, এবং আরও ঠিক হ'লো যে লোপেজই সে-সমস্ত ম্যারিয়াকে বন্দোবস্ত কোরে দেবে।

ম্যারিয়া চিরকাল গ্রামে থাকলেও বুদ্ধিহীনা সে মোটেই ছিল না। ইসাবেলার গায়ে পড়া ভাবটা যে লোপেজ অত্যন্ত অপছন্দ কোরতো ম্যারিয়া তা বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরেছিল, তাই সে মনে মনে প্রথম থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, লোপেজের সঙ্গে সে খুব সংযত ভাবে ব্যবহার কোরবে। তার গ্রামে ফিরে যাবার দিন লোপেজ যখন তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে গিয়েছিল, তাদের বন্ধুত্বটা কায়েমী কোরে রাখবার জন্যও বটে এবং এ-সব কথা চিন্তা কোরেও বটে, লোপেজের সঙ্গে সে একেবারে ভাই-বোন সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেললো।

গ্রামে ফিরেই ম্যারিয়া তার পৌঁছ সংবাদ দিয়ে লোপেজকে একখানা চিঠি দিলো, সঙ্গে জবাব দেবার জন্য একখানা ডাক টিকিট। টিকিট পেয়ে সে বেশ একটু আমোদ অনুভব কোরলো। মনে মনে ভাবলো, ম্যারিয়া আমাকে মনে কোরছে কি? চিঠির জবাব দেবার গরজ তারও কম ছিল না, জবাব সে খুব তাড়াতাড়িই দিলো।

ফেরৎ ডাকে ম্যারিয়া এবং তার বাবা দুজনেই ইউজিনের বিয়েতে লোপেজকেও বিশেষ কোরে নেমণতন্ন ক'রে পাঠালেন।

সুতরাং গ্রিম-পরিবারের সঙ্গে লোপেজও গেল ইউজিনের বিয়ের নেমণতন্ন খেতে ছোট্ট সেই গ্রামে। সেখানে কয়েকটা দিন তার অতি চমৎকার ভাবে কেটে গেলো। ম্যারিয়াদের মুখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সকলেরই লোপেজের প্রতি একটা খুব ভাল ধারণা হ'য়েছিল। সেখানে তার আদর-যত্নের সীমা রইলো না। এত আদর-যত্নে সে অভ্যস্ত ছিল না, মনে মনে প্রথমটা খুশী হোলেও শেষটা প্রায় অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলো। পাড়ার একটি মেয়ে, লোপেজের চেয়ে কিছু বড়ো হবে বয়সে, তার সঙ্গে বিশেষ কোরে আলাপ কোরেছিল। সে একদিন সকলের সামনেই কথায় কথায় বোললো—"দেখো লোপেজ, ম্যারিয়া সাধারণতঃ বেশী কথা-বার্ত্তা বলে না, কিন্তু তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই সে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হোয়ে ওঠে। তাই ব'লে আবার মনে কোরো না যেন, ম্যারিয়া তোমাকে যারপরনাই ভালবাসে। তোমাকে দিয়ে ম্যারিয়ার অনেক উপকার হবার সম্ভবনা র'য়েছে কিনা, তাই তোমার প্রতি সে অতো ভালবাসা দেখায়। যাকে দিয়ে যখন ও উপকার পায় তাকেই ও-রকম দেখানো ওর অভ্যেস। আমি তো ম্যারিয়াকে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখছি, আমি তোমাকে ব'লে দিলাম, তুমি দেখে নিও, আরেকজন উপকারী পেলেই ও তোমাকে ভুলবে।"

ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়েলিস্‌ম, সাম্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে লোপেজের গভীর জ্ঞান ছিল সে কথা সত্যি, কিন্তু সংসার ও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এত অল্প-পরিচিত একটী মেয়ে হঠাৎ গায়ে পড়ে তার একান্ত বন্ধু বোলে পরিচিতা ম্যারিয়ার সম্বন্ধে এ-রকম একটা কঠিন মন্তব্য কেন করতে গেল, অনেক চিন্তা ক'রেও তা ওর মাথায় ঢুকলো না। সে বরং একটু কৌতুকই অনুভব কোরলো। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে একবার ম্যারিয়ার আপাদ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণ

কোরে সকলের সামনেই ঘোষণা কোরলো যে, সে কোন বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না। তারপর সে নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনেই সেভিলে ফিরে এলো।

আর কিছুদিন পরে ম্যারিয়াও এলো সেভিলে। একজন বৃদ্ধ বিধবার বোর্ডিং স্কুলে সে ভর্ত্তি হোল। সমস্ত বন্দোবস্ত লোপেজই কোরে দিল। অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সে খুব বেশী মাত্রাতেই সচেতন ছিল, প্রতি সপ্তাহে সে দু'দিন গিয়ে ম্যারিয়াকে দেখে আসতো, কি তার প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস কোরতো, আর ম্যারিয়ার নানারকম কাল্পনিক বিপদের চিন্তা কোরে সব সময়তেই সে বেশ একটু উদ্বিগ্ন থাকতো। সেই বন্ধুহীন ও অচেনা জায়গায় ম্যারিয়ারও লোপেজই ছিল একমাত্র আশ্রয়-স্থল। লোপেজ না কোরে দিলে কোন কাজই তার পছন্দমত হোত না। সামান্য কিছু কোন কথা থেকে আরম্ভ কোরে গুরুতর কিছু পরামর্শ ব্যাপারে লোপেজরই ডাক পড়তো। এমনি কোরে কাটলো পুরো তিনটি বছোর।

পুরো তিনটি বছোর পরে লোপেজ তার অভ্যাসমত একদিন ম্যারিয়ার বোর্ডিংয়ে গিয়েছে। ম্যারিয়া সেদিন খুব উত্তেজিত এবং বিষাদগ্রস্ত। লোপেজ নিজের কোন দুঃখ-কষ্টকে নির্ব্বিকার চিত্তে বরণ কোরবার মতো মনের জোর রাখতো, কিন্তু অপরের সামান্য কষ্ট দেখলেও বিচলিত না হ'য়ে পারতো না। বিশেষ কোরে ম্যারিয়ার কোন বিপদ আপদে তার স্থির থাকার কথা নয়। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে এবং মিষ্টি কোরে সে ম্যারিয়ার অশান্তির কারণ জানতে চাইলো। উত্তরে ম্যারিয়া তার বাবার হাতের লেখা একখানা চিঠি দিলো লোপেজকে পড়তে। গ্রাম্য হাতের খুব ছোট্ট ছোট্ট লেখা। চিঠিখানা পড়ে মোটমাট সে যা জানতে পারলো তা হচ্ছে এই ; ম্যারিয়ার বাবার সমস্ত আয়-ই জমীর

ফসলের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জমীতে একরকম পোকা দেখা যাওয়ায় হঠাৎ ফসলের ভয়ানক ক্ষতি হোয়েছে, রাণী ক্রিশ্চিনিয়াও কোনরকম খাজনা মাপ কোরবেন না। সুতরাং ম্যারিয়ার সেভিলে থাকার খরচ তিনি আর চালাতে পারবেন না। অথচ তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও তাঁর যে খুব ইচ্ছে তা নয়। ম্যারিয়ার নিজের কি ইচ্ছে তাই তিনি জানতে চেয়েছেন। সহরের একটা বিশেষ মোহ আছে, সেটা তরুণ মনকে বড় আকর্ষণ করে, স্বাভাবিক নিয়মে ম্যারিয়াকেও তা কোরেছিল। তাই গ্রামে ফিরে যাবার কথা সে ভাবতেও পারলো না, কিন্তু সেভিলে থাকতে হ'লে কি উপায় কোরে থাকা যেতে পারে ম্যারিয়া সে সম্বন্ধে লোপেজের কাছে পরামর্শ চাইলো।

লোপেজ যদি তখন ম্যারিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কোরতে পারতো তা হ'লেই বোধ হয় সব দিক দিয়ে ভাল হোত, কিন্তু তাতে বাধা ছিল অনেক। লোপেজ মনে মনে হিসেব কোরলো, প্রথম বাধা—ইসাবেলার বাবার ইচ্ছে লোপেজ শেষ পর্য্যন্ত ইসাবেলাকেই বিয়ে করে, মুখে ঠিক স্পষ্ট কোরে না-বোললেও লোপেজ তা বুঝতে পেরেছিল এবং এই বিয়ে না কোরলে অকৃতজ্ঞতা হবে। সুতরাং লোপেজের পক্ষে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথা, ম্যারিয়ার বাবা ম্যারিয়ার মতো সুন্দরী মেয়েকে সহরের শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে আরও অনেক বড় কিছু যে আশা কোরছিলেন লোপেজ তা জানতো; সুতরাং বিয়েতে যদি সম্মতি না-পাওয়া যায় তাদের বন্ধুত্বেরও বিঘ্ন ঘটতে পারে। লোপেজ কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা মনে কোরছিল অন্য একটা কারণকে। প্রথম থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতান, শুধু পাতান নয়, তাদের সম্বন্ধ আর ব্যবহারও ছিল ঠিক সেই রকমেরই। কোন চিঠিতে ম্যারিয়া হয়তো লিখেছে, "আমার নিজের কোন ভাই নেই, তুমি ঠিক আমার নিজের

ভাইয়ের মতো, আমি তোমাকে একটুও অন্যরকম চোখে দেখি না," অথবা "তুমি আমার ঠিক নিজের দাদার মতো, আমার যদি নিজের দাদাও থাকতো সেও ঠিক তোমার মতোই আমার এত উপকার কোরতো কি-না সন্দেহ।" এই সব চিঠিগুলিও লোপেজের কাছে ছিল খুবই প্রিয়, কারও উপকার কোরে প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা কোরতে সে অভ্যস্ত ছিল না। প্রশংসা না-চাইলেও অযাচিত এই প্রশংসাতে সে খুবই আনন্দ পেতো। এই চিঠিগুলি জমিয়ে রেখে বার বার খুলে খুলে সে পড়তো।

লেখাপড়া খুব বেশী না-জানলেও ম্যারিয়া সেলাইর কাজ খুব ভাল জানতো। দু'জনে অনেক পরামর্শ কোরে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক কোরলো যে ম্যারিয়া কোন বড়লোকের বাড়ীতে সেলাই শিখিয়ে জীবিকা উপার্জ্জন কোরতে চেষ্টা কোরবে। লোপেজ বোললো, "দেখ ম্যারিয়া, এখানে যে একটা সেলাইয়ের স্কুল আছে সে খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখ, সেখানে প্রায়ই কোন-না কোন শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি থাকে। চেষ্টা কোরলে একটা চাকরী পাওয়াও তেমন কঠিন হবে না। তবে একটা কথা, রোজই যে চাকরী খালি হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে; স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর প্রতিপত্তিই সর্ব্বাধিক এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা যে-কোন ভদ্র ঘরের মেয়ের পক্ষেই বিশেষ দুরূহ। যারা নিজের সম্মান রাখতে চায় তারা অবিলম্বেই চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শুধু টিকে থাকে তারাই যারা নিজেরাই বিশেষ খারাপ, নয়তো একেবারে অসহায় এবং নিরুপায়, তবে মাইনে খুব বেশী, পঁয়ত্রিশ পেসেটা।"

ম্যারিয়া নিজ থেকেই বোললো "না, অমন জায়গায় কাজ কোরতে চাই না, মাইনে অল্প হোলেও কোন ভাল জায়গায় তুমি চেষ্টা ক'রো।"

তার এই কথায় ম্যারিয়ার সম্বন্ধে লোপেজের মনে আরও ভাল একটা ধারণা হোল। লোপেজ ভাবলো, ম্যারিয়া তা-হ'লে টাকাটাই জীবনের সকল বস্তুর ওপরে স্থান দেয় না।

ম্যারিয়ার জন্য লোপেজের চাকরির চেষ্টা করা মানে অবশ্য বড় বড় লোকের বাড়ীর খোঁজ কোরে সোজা কড়া নেড়ে গিয়ে হাজির হওয়া। গোটা কয়েক বাড়ীর পরে সত্যিই এক জায়গায় হদিস্ মিললো। দাঁত উচু বুড়ো এক ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একেবারে রুখে এলেন—"কি চাই আপনার?"

"শুনলাম যে আপনার বাড়ীতে একজন সেলাই শেখাবার শিক্ষয়িত্রী দরকার"—লোপেজ যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে উত্তর কোরলো।

"হ্যাঁ, তা একজন দরকার ঠিকই, কিন্তু আপনি জানলেন কোত্থেকে?"

লোপেজকে অবশ্য বাধ্য হোয়েই এ-প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে হোল।

"কতো মাইনে দেবেন?"

"কুড়ি পেসেটা।"

ম্যারিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই চাকরিতেই বহাল হোল। কিন্তু দেখা গেল টাকা-পয়সা সম্বন্ধে সেই ভদ্রলোকের হাতটা ঠিক তার দাঁতগুলির মতোই অতটা দরাজ নয়: তিনি ম্যারিয়ার নিরুপায় অবস্থা বুঝে পনের পেসেটার এক পেসেটাও বেশী দিতে রাজী হোলেন না। উপায়ন্তর নেই, ম্যারিয়াকে তাতেই স্বীকৃত হোতে হোল।

ধীরে ধীরে আরও একটী বছর গেল গড়িয়ে।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ কোরে লোপেজ আর ম্যারিয়ার বন্ধুত্বটা আরও প্রগাঢ় হওয়া ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না ওদের জীবনে—এই এক বছরের মধ্যে। তারপর ম্যারিয়া একবার কিছুদিনের

ছুটী নিয়ে তাদের দেশের বাড়ীতে গেল। ফিরে এসে লোপেজকে বোললো, "দেখ, বাবা এতদিন যা অল্প মাত্র কিছু সাহায্য কোরতেন, অবস্থার গতিকে এবার বোধ হয় তাও বন্ধ কোরে দিতে বাধ্য হবেন, এবার এর থেকে কিছু বেশী টাকা না-রোজগার কোরতে পারলে নয়-ই।" সেলাইয়ের স্কুল সম্বন্ধে লোপেজের বিশেষ বিতৃষ্ণা থাকাতে সেখানে ছাড়া আর প্রায় তার সমস্ত জানা জায়গাতেই আপ্রাণ চেষ্টা কোরলো, কিন্তু মাইনের হার তখন কোমেছে বই বাড়েনি, কাজেই কিছু সুবিধে হোল না।

একদিন লোপেজ ম্যারিয়ার বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখে যে তাদেরই সম-বয়সী একজন যুবক চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে বসে মেয়েলী ঢংয়ে হাত-পা নেড়ে চুপি চুপি ম্যারিয়াকে কি বোঝাচ্ছে। লোপেজ প্রথমটা একটু বিশেষ অবাকই হোয়েছিল; কারণ এই সহরে ম্যারিয়ার আর কেউ পরিচিত আছে ব'লে সে জানতো না। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ম্যারিয়া লোপেজের সঙ্গে সেই যুবকটীর পরিচয় কোরিয়ে দিলো না; সে চলে গেলে ম্যারিয়া লোপেজকে বোললো—"এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ক্যাম্পোজ, সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য, সম্প্রতি জেল থেকে খালাস পেয়েছেন, আমাদের আত্মীয় এবং গ্রামের লোক।" সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে লোপেজের কোনদিনই বিশেষ ভাল ধারণা ছিল না। সে জানতো এ-সব লোকেরা যদিও স্পেনীয় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কোরতে চায়, এরা যদিও বা নিজেদের ধর্ম্মমূলক রাজত্ব স্থাপন কোরতেও পারে, তাতে স্পেনের অত্যাচারিত কৃষক আর শ্রমিকের দুঃখ কিছুমাত্র লাঘব হবে না, এরা শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল কোরতেই তৎপর থাকবে। ক্যাম্পোজের মধ্যে আরেকজন সাধারণতন্ত্রীর নমুনা দেখে স্পেনের আর সমস্ত সাধারণতন্ত্রবাদীদের সম্বন্ধে লোপেজের

আরও খারাপ ছাড়া ভাল ধারণা হ'লো না। কিন্তু ক্যাম্পোজ হচ্ছে ম্যারিয়ার বিশেষ আত্মীয় এবং বন্ধু, এমন কি ম্যারিয়ার পক্ষে তাদের দল-ভুক্ত লোক হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং তার কাছে এ-সব কথা বোলে কিছু লাভ নেই।

কয়েকদিন পরে ম্যারিয়া একদিন লোপেজকে বোললোঃ "জান লোপেজ, ক্যাম্পোজ বোলেছে যে সে যেমন কোরে পারে সেলাইয়ের স্কুলে আমার একটা চাকরি ঠিক ক'রে দেবে"। তার কথা শেষ হতে না-হতেই ক্যাম্পোজ এসে ঘরে ঢুকলো, হাতে একখানা চিঠি—মুখে বিজয়-গর্ব্বের হাসি! হস্ত-পদ আস্ফালন আর নিজের এবং দলের কীর্ত্তি কীর্ত্তন কোরে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা কোরে সে যা বোললো, তার সার মর্ম্ম হোচ্ছে এই; অর্থ-নৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া বড় দুষ্কর হোয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ এত বেশী টাকার চাকরি। পরিচালক মণ্ডলীর বিশিষ্ট কোন সদস্যের অনুগ্রহ-প্রাপ্তা কোন মেয়ে ছাড়া আজকাল আর কেউ-ই চাকরি পায় না। ম্যারিয়ারও কোন আশা ছিল না, বস্তুতঃ একজন সদস্যের সুপারিশ করা একটী মেয়ের নামে নিয়োগ-পত্র পর্য্যন্ত লেখা হোয়ে গিয়েছিল, এমন সময় ক্যাম্পোজ গিয়ে হাজির, সঙ্গে ছিলেন সেই স্কুলেরই একজন কর্ম্মচারী, ক্যাম্পোজের দলের লোক। তিনিই নানান্ রকম ফিকির-ফন্দি কোরে সেই নাম কেটে, খাতায় আর নিয়োগ-পত্রে ম্যারিয়ার নামটা বসিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাইতেই ম্যারিয়ার এই চাকরিটা হোয়েছে।

এই ঘটনায় লোপেজ রীতিমত বিস্মিত, আতঙ্কিত এবং দুঃখিত হোল। এর আগে স্বপ্নেও সে বুঝতে পারেনি যে ম্যারিয়া মুখে অস্বীকার কোরলেও মনে মনে এই চাকরিটির জন্যই এত লালায়িত ছিল। প্রথম মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হোলেও, পরে সে বুঝতে

পারলো কেন ম্যারিয়া এই চাকরিটির কথা তার কাছে না ব'লে ক্যাম্পোজের কাছেই বলতে গেল, এই চাকরিটি সম্বন্ধে লোপেজের অভিমত ম্যারিয়া খুব ভালভাবেই জানতো, তাই তাকে সে কিছু বলেনি।

ম্যারিয়ার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে লোপেজ এইভাবে কিছুটা হতাশ হোলেও—বিশেষভাবে দুঃখিত হোল অন্য একটা কারণে। নিয়োগ-পত্র ইত্যাদিতে যার নাম কেটে ম্যারিয়ার নাম বসান হোয়েছে, লোপেজ তার কথা বিশেষভাবে জানতো। সে একজন দুঃস্থা বিধবা, তার একমাত্র পুত্র রাজনৈতিক অপরাধে জেল খাটছে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে তার দিন কাটে। অনেকের হাতে-পায়ে ধ'রে বহু কষ্টে সে এই চাকরিটি যোগাড় করতে পেরেছিলো। ম্যারিয়ার যত কষ্টই হোয়ে থাক, একেবারে এরকম শোচনীয় অবস্থা তার নয়। তারই অতি পরিচিত একজনের চাকরির জন্য এই দুঃস্থাকে বঞ্চনা করা হোয়েছে, এই কথা ভেবে লোপেজ আরও মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যথিত হোল।

অথচ এই বঞ্চনা-প্রবঞ্চনার বিলোপ করাই তার সাম্যবাদের সাধনা। লোপেজ বেশী দিন স্থির থাকতে পারলো না, একদিন এই নিয়ে ম্যারিয়ার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়াই কোরলো। ম্যারিয়া স্পষ্ট জানালো যে এ সব বড় কথা সে বোঝে না, তার যাতে লাভ হবে সে তাই কোরবে, তা' ছাড়া সাম্যবাদীরা ধর্ম্ম মানে না, সুতরাং তাদের আদর্শের সঙ্গে ম্যারিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

এ ঝগড়া যদিও দু'একদিনের মধ্যে মিটে গেল, এর পর থেকেই লোপেজের প্রতি ম্যারিয়ার ব্যবহার কেমন যেন অন্য রকম হোয়ে যেতে লাগলো। ম্যারিয়া আর লোপেজের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশে না, যা কিছু তার পরামর্শ সে ক্যাম্পোজের সঙ্গেই করে। লোপেজ আর ক্যাম্পোজ দু'জনে এক জায়গায় থাকলে লোপেজকে কতকটা

অবহেলা কোরে সে ক্যাম্পোজকেই কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে খুশী রাখতে চেষ্টা করে। এমন অনেকদিন হোয়েছে লোপেজ চুপচাপ বসে থেকে থেকে কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে তা' সে জানতেও পারেনি। লোপেজ মনে মনে ভাবতো, এ অবহেলাটা বোধহয় তার মনেরই ভুল হবে। তাদের এতদিনের বন্ধুত্ব এত সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে এটা সে কল্পনাতেও আনতে পারছিল না।

শেষে একদিন মনে হোল যে তার ভুল ভেঙ্গেছে। একদিন ক্যাম্পোজ আর ম্যারিয়া চাপা উত্তেজনার স্বরে কি যেন আলাপ কোরছিল, এমন সময় একেবারে অতর্কিত ভাবে লোপেজ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ম্যারিয়া শুধু একবার তার দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পোজকে ইসারায় ডেকে অন্য একটা ঘরের মধ্যে চলে গেল। লোপেজ শুধু স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, এবার আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে কি সেই অল্প-পরিচিতা পল্লীবালার অযাচিত ভবিষ্যত-বাণীই ঠিক! লোপেজ তার নিজের মনকে বোঝাতে চাইলো, "আমি ম্যারিয়ার জন্য যা কোরেছি তা তো শুধু কর্ত্তব্য বোধেই কোরেছি, প্রতিদানের প্রত্যাশায় যখন কিছু করিনি তখন আর দুঃখ কি?"

কিন্তু আসলে তা নয়। লোপেজ যদিও ম্যারিয়ার জন্য যা কিছু কোরতো নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই কোরতো, ম্যারিয়াকে ব্যক্তিগতভাবে সে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছিলো। এ ভালবাসা তার একদিনে হয়নি, দিনের পর দিন বছরের পর বছরে এ ভালবাসা তার পরিণতি লাভ কোরেছে তিল তিল কোরে, তার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। এ ভালবাসা তার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলো, এ রকম রূঢ়ভাবে আহত হবার আগে পর্য্যন্ত এ ভালবাসা যে কত গভীর, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

ম্যারিয়ার এই ইচ্ছাকৃত অবহেলায় লোপেজ মর্ম্মান্তিকভাবে দুঃখিত হোয়েছিলো। কিন্তু এ কথা সে নিশ্চিতভাবে জানতো, অনুরোধ উপরোধ কিংবা ঝগড়া কোরে ভালবাসা ফেরৎ পাওয়া যায় না। সে ঠিক কোরলো ম্যারিয়ার কাছ থেকে সে বহুদূরে চলে যাবে, ম্যারিয়াকে তার ভুলতে হবে, তা না হোলে জীবনে তার শান্তি আসবে না। স্পেনের উত্তর উপকূলে বিলবাও নামে একটা বন্দর আছে, সেই বন্দরে একটা চাকরি খালি হোয়েছে জেনে লোপেজ তার প্রার্থী হোল। ঘটনাচক্রে নিয়োগপত্রও এলো ঠিকই। মামার অনুমতি নিয়ে হোটেলের চাকরীও সে ছেড়ে দিল।

কাল ভোরে তার গাড়ী চড়তে হবে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ কোরে সে ভারাক্রান্ত মনে ম্যারিয়ার সঙ্গে একবার শেষ দেখা কোরতে চললো। সেইদিনকার ঘটনার পর আর সে ওদিকে যায়নি, সকল রকম অপমানের জন্য তার প্রস্তুত হোয়ে থাকতে হোল, কিন্তু তবুও ম্যারিয়াকে আরেকবার দেখার আকাঙ্ক্ষাও সে দমন কোরতে পারলো না।

ক্যাম্পোজ সেদিন হাজির ছিল না। যথাসম্ভব আনন্দের ভাব দেখিয়ে ম্যারিয়াকে সে এই "সুসংবাদটা" দিল, ম্যারিয়াও এই সুসংবাদ শুনে তাকে অভিনন্দিত কোরলো, কিন্তু পরে গম্ভীর হোয়ে বোললো—"বিলবাও! সেতো এখান থেকে অনেক দূর, মাইনে বেশী হোতে পারে, কিন্তু এতদূরে যাচ্ছ কেন?"

"এমনি। সেভিল জায়গাটা আমার আর ভাল লাগছে না।"

সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে এসে দেখে তার নামে একখানা চিঠি; ম্যারিয়া লিখেছে: "লোপেজ, তুমি আমায় ভুল বুঝেছ, অবিলম্বে আমার সঙ্গে তুমি আরেকবার এসে দেখা করো।" নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার সে ম্যারিয়ার কাছে ফিরে চললো। ম্যারিয়া তার জন্য দরজাতেই

অপেক্ষা কোরছিল। তারা দুজনে আগেকার মতো বেড়াতে বেড়াতে সহরের একপ্রান্তে একটা বিলের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো। এতক্ষণ দুজনে তারা কেউ কোন কথা বলেনি। দুজনেই বিচলিত, ম্যারিয়ার ভাষাও ছিল অসংলগ্ন, ম্যারিয়া লোপেজের কাঁধের ওপর মাথা রাখলো—"তুমি যেওনা লোপেজ, তুমি চলে গেলে আমার বড় কষ্ট হবে। তাছাড়া আমার কেন যেন মনে হোচ্ছে যে আমারই কারণে তুমি সেভিল ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তুমি আমায় ভুল বুঝো না লোপেজ!"

লোপেজ নেহাৎ ছেলেমানষী অভিযোগের সুরে বোললো, "তবে তুমি ক্যাম্পোজকে খাতির কোরতে গিয়ে আমার অমন অবহেলা কর কেন?"

উত্তরে ম্যারিয়া যদি স্পষ্ট কোরে বোলতে পারতো—"সে আমার স্বার্থের খাতিরে এবং তোমাকে নিতান্ত আপনার ভেবে," তাহলেই বোধহয় বেশী ভাল হোত। কিন্তু সে তা বোলতে পারলো না।

—"কই, তোমায় আমি অবহেলা তো কিছু করি না, ও আমার ছেলেবেলা থেকেই আমাকে খুব স্নেহ করে, অল্পদিনের জন্য সে সেভিলে এসেছে, আদর যত্নের কিছু যদি ত্রুটী হয়,—তাতে বিশেষ কিছু মনে কোরতে পারে, তাই। তা'ছাড়া তোমাকে আড়াল কোরে আমরা যে সব কথা বলি, সেগুলি আমাদের গুপ্ত সাধারণতন্ত্রী দলের নিতান্ত গোপনীয় কথা ছাড়া আর কিছু নয়।"

লোপেজ এবার দৃঢ়ভাবে বোললো, "এসব কোন অজুহাত আমি শুনতে প্রস্তুত নই, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বটা বজায় রাখতে যদি তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছে থেকে থাকে, তবে কোন সময়েই কোন অজুহাতেই শুধু ক্যাম্পোজকে খুশী রাখবার জন্য আমাকে তাচ্ছিল্য কোরতে পারবে না।"

—"তোমার চেয়ে কেউ কখনও আমার বেশী আপন হোতে পারে লোপেজ, একথা কি তুমি সত্যিই বিশ্বেস কোরতে পার?"

সেদিন শীত ছিল খুব অল্প। আকাশ ছিল আলোয় আলোময়, চারিদিকের পাতলা কুয়াশা সমস্ত পৃথিবীটার ওপরে একটা রহস্যময় মায়াজালের সৃষ্টি কোরেছিল। সর্ব্বোপরি ম্যারিয়ার স্বরে ছিল একটা হৃদয়-স্পর্শকারী আদ্র্‌তা, এমন একটা আর্দ্রতা যা নাকি লোপেজকে তার বক্তব্যের আন্তরিকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ কোরে দিল। লোপেজ অনেকটা অপ্রস্তুত হোয়েই যেন এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা বদলে ফেললো।

"ম্যারিয়া, তোমার বয়স এখন জানি কতো ?"

"বাইশ, তোমার ?"

"চব্বিশ।"

ঠিক এই সময় লোপেজ আর ম্যারিয়ার মধ্যে পাতানো সম্পর্কের বাধাটা একেবারে দূর হোয়ে গেল। স্থির হোল যে কেউ অনুমতি দিক আর না দিক, ম্যারিয়া আর কয়েকদিনের মধ্যেই একবার তাদের গ্রামে গিয়ে তার বাপ-মার সঙ্গে দেখা কোরে এসে লোপেজকে বিয়ে কোরবে।

ক্যাম্পোজ সম্বন্ধে লোপেজের ধারণা কি ছিলো তা আগেই বোলেছি, লোপেজ সম্বন্ধে ক্যাম্পোজের মনোভাব ছিল ঠিক তারই প্রতিচ্ছায়া। মুখে অনেক বড় বড় কথা আওড়ালেও সাম্যবাদ কিংবা অন্য কোন 'বাদ' সম্বন্ধেই তার কোন ধারণা ছিল না। লোপেজ তাদের দলের লোক নয়, লোপেজের প্রতি তার প্রবল বিদ্বেষের কারণ ছিল শুধু এই-ই। যখন সে জানল যে ম্যারিয়া লোপেজকে বিয়ে কোরতে যাচ্ছে তখন তার অসন্তুষ্টি বাড়লো ছাড়া কমলো না। কিন্তু লোপেজের মজুর-দলে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, তাই সে তাকে সামনা সামনি না ঘাটিয়ে কৌশল অবলম্বন কোরলো। প্রথম সে একবার

গ্রামে গেল, সেখানে গিয়ে লোপেজ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে যত রকম হীন প্রচার করা যায় ম্যারিয়ার কাছে তা কোরলো। তারপর সেভিলে ফিরে এসে ইসাবেলার ভাই জোভেলারকে হাত কোরে প্রচার কোরলো যে, লোপেজের সঙ্গে ইসাবেলারই বিয়ে হবে, লোপেজ ম্যারিয়াকে বিয়ে কোরবার প্রতিজ্ঞা শীগ্‌গিরই বাতিল কোরে দেবে। তারপর লোপেজের কাছে গিয়ে বললো যে সে সাম্যবাদী হোতে চায়।

লোপেজ তখন ম্যারিয়াকে পাবার আশার আনন্দে বিভোর, সমস্ত পৃথিবীটাকেই সে তখন ক্ষমা কোরতে পারে। তার মনে প্রবল আশা হোল যে ক্যাম্পোজকে সে নিজের মত অনুযায়ী গড়ে তুলবে।

কিন্তু ক্যাম্পোজের ধূর্ত্ততার তুলনায় লোপেজ ছিলো নিতান্ত শিশু। এখন সে যা যা কোরছিলো সবই তার চক্রান্ত সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমে সে ম্যারিয়াকে জানালো যে লোপেজের সঙ্গে এখন তার খুব ভাব হোয়েছে। কিছুদিন পরে জোভেলারের মারফৎ লোপেজ আর ইসাবেলার 'বিয়ের' সংবাদটা অতি সুকৌশলে ম্যারিয়ার কানে ওঠালো। ম্যারিয়া এ-সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ক্যাম্পো-জের কাছে চিঠি লিখলো।

উত্তরে ক্যাম্পোজ লিখলো যে, এ-সংবাদ সে আগেই জানতো তবে ম্যারিয়া মনক্ষুণ্ণ হবে জেনে তাকে কিছু লেখেনি। যা'হোক ম্যারিয়ার চিঠি পাবার পর ম্যারিয়ার হোয়ে অনুরোধ কোরবার জন্য লোপেজের কাছে সে গিয়েছিলো, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এজন্য লোপেজের হাতে তাকে ভয়ানকভাবে অপমানিতই হোতে হোয়েছে।

এ উত্তর ম্যারিয়া সহজে বিশ্বাস কোরে উঠতে পারছিলো না; কিন্তু তার ধারণা যে লোপেজ আর ক্যাম্পোজ তাদের পুরাণো বিদ্বেষ ভুলে গিয়েছে, কাজেই ক্যাম্পোজ নিশ্চয়ই ঠিক কথাই লিখেছে। সে

মারও ভাবলো আহা, ক্যাম্পোজ শুধু আমার জন্যই লোপেজের হাতে অপমানিত হোয়েছে ! ক্যাম্পোজকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একখানা চিঠি দিল। মন তখন তার অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত এবং লোপেজের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠেছে, তাই সে লিখলো,—“লোপেজের মতো বিশ্বাসঘাতকের তুলনা পাওয়া যায় না, তার মত দুষ্প্রবৃত্তির লোক আর আমি একটীও দেখিনি, তুমি কিছু মনে কোর না।”

ক্যাম্পোজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল, সে চিঠির এই অংশটুকুই লোপেজকে পড়তে দিল। লোপেজ পড়লো, ম্যারিয়ার হাতের পরিষ্কার লেখা,—“লোপেজের মতো বিশ্বাসঘাতকের তুলনা পাওয়া যায় না, তার মতো দুষ্প্রবৃত্তির লোক আর আমি একটীও দেখিনি।”

কথাগুলির ঠিক ঠিক যে মানে কি, কতক্ষণ পর্য্যন্ত লোপেজের তা বোধগম্যই হোল না। মনের ভাব তার কি হয় তাই দেখবার জন্য লোপেজ দেখলো, ক্যাম্পোজ তার মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। সে বুঝলো যে সে যদি কাতরতার ভাব দেখায় ক্যাম্পোজ তাতে পৈশাচিক আনন্দ অনুভব কোরবে, তাই নিজের দৃঢ়তা বজায় রেখে সংক্ষেপে বললো “বয়ে গেছে” এবং ক্যাম্পোজকে বিদায় কোরে দিল।

তারপর কথাগুলির অর্থ এবং তার ফলাফল আস্তে আস্তে লোপেজের মনে পরিষ্কার হোয়ে উঠলো। ম্যারিয়াকে বিয়ে করার ব্যাপার নিয়ে সে তার একান্ত স্নেহ-প্রবণ মামার মনে কষ্ট দিয়ে আলাদা বাড়ীতে উঠে এসেছে ঃ ম্যারিয়ার কাছে আশা পেয়ে সে তার বিলবাওয়ের চাকরিতে যায়নি, অথচ তার হোটেলের পুরাণো চাকরিটীও গেছে। অবশ্য ম্যারিয়াকে পেলে এসব সে অতি সহজেই ভুলতে পারতো। এই একটু আগেও, ম্যারিয়াকে পেলে সে কি পরিমাণ সুখী হোতে পারবে,

তারই একটা দিবা-স্বপ্ন রচনা কোরেছে, কিন্তু সে-সকল আশাই এখন তার নিজের মন থেকে জলাঞ্জলী দিতে হোল। লোপেজ এবার নিজের মনে নিঃসন্দেহ হোল যে ম্যারিয়া এতদিন তার প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছে সে শুধু তার স্বার্থেরই খাতিরে। তার ভালবাসা অপাত্রে পড়ার ক্ষোভে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল। সে তার মনে মনে বুঝলো, পৌত্তলিকরা যেমন মাটীর পুতুলে দেবীত্ব আরোপ কোরে পূজো করে, সেও তেমনি ম্যারিয়াকে সাধারণের চেয়ে কিছু উন্নত মনে কোরেই ভালবেসেছিল ; কিন্তু সামান্য রক্তমাংস আর স্বার্থের মানুষ ছাড়া ম্যারিয়া আর কিছুই নয়।

কাজকর্ম্ম কম, চাকরী-বাকরী নেই, সমস্ত দিনটা সে সেভিলের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো মনের শান্তির জন্য, কিন্তু শান্তি কোথাও নেই। গত চার বছরে ম্যারিয়াকে নিয়ে ঘোরেনি সহরে এমন কোন জায়গা নেই, সকল জায়গাতেই ম্যারিয়ার স্মৃতি বিজড়িত। বিকেলবেলা খেয়াল শূণ্য অবস্থায় সেই বিলটা, যার ধারে বসে ম্যারিয়া তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো যে, ম্যারিয়ার মনে লোপেজের আসনই সকলকার ওপরে, সেখানে সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হোল। জায়গাটা আর চেনা যায় না, গাছের গুঁড়িটা নেই, অন্য গাছগুলিও কারা কেটে নিয়ে গেছে। লোপেজ গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবলো, পৃথিবীটা এরকম ভাবেই বদলায় বটে, আজকের চেনা জিনিষ কালকে শুধু স্মৃতির বিভ্রম বলে মনে হয়!

লোপেজের মনে অসহ্য জ্বালা, সামনে প্রাণ-জুড়ানো-স্নিগ্ধতার আভাষভরা গভীর কালো জল, সে যেন প্রায় প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ নিয়ম বশতঃই ওপরের পার থেকে নেমে নীচের দিকে চললো। হঠাৎ শীতল জলের স্পর্শ পায়ে লাগতেই তার মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে

গিয়ে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ চেতনা ফিরে এলো—লোপেজ বুঝলো যে সে আত্ম-হত্যা কোরতে যাচ্ছে। পা তখনও জলে, লোপেজ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, কেউ তাকে দেখছে কিনা। পাশেই গ্রামের পথ, সেই পথ দিয়ে দিনের কাজ শেষ কোরে ঘরে ফিরে চলেছে একদল শ্রমিক। উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগের স্পেনের শ্রমিক ; রাজার অত্যাচারে নিপীড়িত, কুব্জ দেহ, অশিক্ষিত কর্ম্মক্লান্ত মানব-পশু। তাদের চোখে-মুখে আর চলন-ভঙ্গীতে শুধু সমস্ত জীবনের বেদনার আভাষ। তারা চলে গেলে পরও অনেকক্ষণ সে জলে দাঁড়িয়ে রইলো, এই শ্রমিক-পথিকের দল কি বাস্তব না তার পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনা ? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো যে, যে জীবন সে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছে, সে জীবন তার নিজের নয়, সর্ব্বহারাদের কল্যাণে বহুকাল পূর্ব্বেই সেটা উৎসর্গ কোরে রেখেছে।

তাই, জীবনে তার কোন রকম সাধ না থাকা সত্ত্বেও লোপেজ সেবার মরতে পারলো না।

মরা সেবারকার মতো হোল না, কিন্তু সেভিলে থাকাও তার পক্ষে আর অসম্ভব, এখানকার প্রতিটি রাস্তাঘাট, প্রতিটি ছোটখাট ঘটনা ম্যারিয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত কোরে তোলে। অনেক কষ্টে একটা চাকরী পাওয়া গেল সুদূর সেই বার্সিলোনাতে। মাইনে অনেক কম, তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ ; কিন্তু যে কোন উপায়ে হোক তাকে সেভিল ছাড়তে হবেই।

সেভিলের সেই ছোট্ট ষ্টেশন, যেখানে সে ম্যারিয়াকে প্রথম পেয়েছিলো এবং যেখানে সে আবার তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার মনে কেমন জানি একটা বিভ্রম জাগছিলো, কেউ বুঝি তাকে আহ্বান লিপি পাঠাবে, "তুমি যেও না লোপেজ, আমায় তুমি ভুল বুঝো না !"

বার্সিলোনায় গিয়ে লোপেজ কথঞ্চিৎ শান্তি পেল। নতুন দেশ, নতুন কর্ম্মক্ষেত্র। শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশী, অথচ কোনরকমের আন্দোলন নেই। লোপেজের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ, আবার সে নতুন করে জীবন আরম্ভ কোরবে ঠিক কোরলো।

অবশ্য তার প্রধান কাজই হোল রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্যবাদের প্রচার আর শ্রমিক সংগঠন, যে সমাজ-ব্যবস্থার ফলে মানুষ অর্থের পদতলে দয়া, মায়া, প্রেম আর সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়, স্পেনের সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাম্যবাদের, যেখানে মানুষ শুধু মানুষ রূপেই জাবন ধারণ কোরতে পারবে—অর্থের ক্রীতদাসরূপে নয়।

এদিকে ক্যাম্পোজদের দলও যে একেবারে নিঃশ্চেষ্ট ছিল তা নয়, তারাও শুধু ধর্ম্মের নামে দেশশুদ্ধ লোককে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলো। আর ওদিকে লোপেজের নেতৃত্বে বার্সিলোনা আর চারিদিকের অঞ্চলে শ্রমিক শক্তি ক্রমশঃ দুর্দ্দমনীয় হোয়ে উঠেছে। রাণী ক্রিষ্টিনা এই দুই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সাগাষ্টা নামে একজন নামকরা বর্ব্বরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কোরতে আহ্বান কোরলেন। এই সাগাষ্টার অত্যাচারে বার্সিলোনা আর সারাগোসার চারপাশে লোপেজের নেতৃত্বে প্রথম ব্যাপক ধর্ম্মঘট দেখা দেয়। অত্যাচার আরও বাড়লো, শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট রূপান্তরিত হোল সশস্ত্র বিদ্রোহে। ১৯০১ সালে জেনারেল ওয়েলার তার সমগ্র সেনা-বাহিনী নিয়ে শ্রমিকদলকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ কোরলো, লোপেজরা পরাজিত হোল, এবং লোপেজ নিজে আহত অবস্থায় বন্দী হোল। ১৯০৯ সালে সে কারামুক্ত হোয়েই আবার আরম্ভ কোরলো বিপ্লব; বার্সিলোনার রাজপথে রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগলো। গভর্ণমেণ্টের সৈন্য এবং বিপ্লবীদের মৃতদেহ একসঙ্গে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। বিপ্লব

ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত স্পেন দেশেই কঠোর সামরিক আইন জারি করা হোল।

এবার আর গভর্ণমেণ্ট লোপেজকে ধরতে পারলো না। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বিপ্লবী লেখক সেনর ফেরার ছিলেন লোপেজের বিশিষ্ট বন্ধু, শুধু আক্রোশ বশতঃই গভর্ণমেণ্ট তাকে গুলি কোরে মারলো।

১৯১১ সালে আবার লোপেজের নেতৃত্বে সমগ্র স্পেনে ব্যাপক ভাবে রেলওয়ে ধর্ম্মঘট হোল। মন্ত্রী ক্যানালাজেস্ সামরিক আইনের ২২১ ধারা প্রয়োগে প্রত্যেক সমর্থ প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি কোরে এই অশান্তিকে দমন কোরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১২ সালে লোপেজ তাকে গুলির আঘাতে হত্যা করায় তার কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত হোতে পারলো না।

তারপর সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বছরগুলি কেটে যেতে লাগলো, ঠিক এক একটী দিনের মতো।

তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় অবশেষে রাজতন্ত্র ধ্বংশ হোয়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হোল।

তার বার্দ্ধক্য ঘনিয়ে আস্‌ছে, স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে, "পপুলার ফ্রণ্ট" গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের পর, লোপেজ নিশ্চিন্ত মনে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ কোরলো।

অবসর গ্রহণ কোরবার পর সুখেই তার দিন কাটছিলো। তার অতীত ছিল গৌরবময়, স্পেনের গণতন্ত্র ও শ্রমিক-কৃষকের রাজত্বের জন্য আজীবন সে যুদ্ধ কোরেছে, তার ভগ্ন-শরীর আর অসংখ্য নিপীড়নের ক্ষত এখন তার একরকম গর্ব্বের বিষয়ই হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কত দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তো শুধু তার সঙ্গে দেখা করতে, তার মুখের কথা শুনতে।

কিন্তু "পপুলার ফ্রন্ট" গভর্ণমেণ্ট সুচারুভাবে পরিচালনা কোরবার পথে শীঘ্রই কয়েকটী অন্তরায় দেখা দিলো। অন্তরায়গুলির মধ্যে দুটীই সর্ব্বপ্রধান। "পপুলার ফ্রণ্টের" গঠন কর্ত্তারা মনে কোরেছিলেন যে, সমস্ত বামপন্থীরা একত্রিত হোলে সাম্যবাদের শক্তি আরও বেড়ে যাবে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, মিলনের চেয়ে মতান্তরই ক্রমশঃ বেশী হ'তে থেকে গণতন্ত্রেরই ক্ষতি হোচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ এই অন্তর্ব্বিরোধের সুযোগ নিয়ে, আগে যারা নাকি সাধারণতন্ত্রী নামে পরিচিত ছিল, সেই সব গণতন্ত্র বিরোধীরাই ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। সমস্ত বামপন্থীরা যখন গৃহ-বিবাদেই বল ক্ষয় কোরতে ব্যস্ত, এই সব গণতন্ত্র বিরোধীরা তখন সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অতি সুকৌশলে ভুল ধারণার বীজ বপন কোরতে ব্যাপৃত। প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ কোরলেও এই সমস্ত বিপদের কথা লোপেজের কানে পেঁ|ছে তাকে চিন্তিত কোরে তুললো।

দু'একবার সে এই সব বিপক্ষ প্রচারের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেল। সেভিলের আশে-পাশ থেকে তার পূর্ব্ব পরিচিত কয়েকদল শ্রমিক এসেছিলো লোপেজের সঙ্গে দেখা কোরতে। তারা কেউ জিজ্ঞেস কোরলো, "আপনাদের সাম্যবাদের মত নাকি দেশের চাষা-মজুরদের দরিদ্র আর অর্দ্ধভুক্ত কোরে রাখা? চাষা আর মজুরদের কথা ভুলে গিয়ে এখন নাকি আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি কোরতেই ব্যস্ত হোয়েছেন, নয়ত গভর্ণমেণ্টের বেশীর ভাগ পদগুলিই তারা পায় কেন? আপনারা নাকি আমাদের সকল গীর্জ্জাগুলিই বাজেয়াপ্ত কোরবেন? কারো কাছে পবিত্র ক্রুশ পাওয়া গেলে আপনারা নাকি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোরবেন!"

এই সকল কথা শুনে লোপেজ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হোল, দেখলো যে, চক্রান্তকারীদের অপকৌশলে তার আজীবনের সাধনা প্রায় বিফল হোতে চলেছে। নিজে যতটা পারলো তাদের ভুল সে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কোরলো। শেষে তাদের সে জিজ্ঞাসা কোরলো, "এ সব চমকপ্রদ খবর আপনারা পান কোত্থেকে?"

"ভেতরের খবর যারা জানেন তাঁরাই বলেন, তা না হোলে কি আর আমরা বিশ্বাস করি? সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সাম্যবাদীদের উচ্ছৃঙ্খলতায় দল ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছেই আমরা এ সব কথা শুনি।"

"তাঁদের দু'একজনের আপনারা নাম বোলতে পারেন?"

"দলের যিনি নেতা তাঁর নাম ক্যাম্পোজ।"

ক্যাম্পোজ! সঙ্গে সঙ্গে লোপেজের মনের নিভৃত কন্দরের মাঝখানে ভেসে উঠলো, বহুদিনকার হারানো একখানা মুখ। ক্যাম্পোজের চাতুরী শেষ পর্য্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিলো; কিন্তু তা এত পরে যে তখন আর তার কোন প্রতিবিধান নেই। লোপেজ দেখলো যে তার আর ম্যারিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য যে কৌশল ক্যাম্পোজ অবলম্বন কোরেছিল, অজ্ঞ জনসাধারণকে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য ক্যাম্পোজের দলেরা ঠিক সেই একই পন্থা গ্রহণ কোরেছে। সেই বেশী টাকার লোভ আর ধর্ম্ম ভয় দেখানো, সেই গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব আর মিথ্যা প্রচার—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে!

সেই শ্রমিক আর কৃষকদলের কাছে সে জানিয়ে দিলো এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবিধান সে যেমন কোরে পারে কোরবে। কিন্তু কথাটাকে কার্য্যে পরিণত কোরতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধের স্বভাবতঃই কয়েকদিন দেরী হোয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্যাম্পোজের কানে উঠলো লোপেজের সঙ্কল্পের কথা। ক্যাম্পোজ চিন্তিত হোল।

একদিন সকাল বেলা লোপেজ তার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো। এমন সময় হুড়-মুড় কোরে ঢুকে পড়লো একদল সৈনিক। তাদের নেতা সামরিক কায়দায় তাকে অভিবাদন জানালো—

"মহামান্য ডন্ লোপেজ, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু সেভিলে যেতে হবে, এক্ষুণি।"

"কেন, তা তোমরা কিছু জান ?"

"না, ফ্রাঙ্কোর আদেশ।"

লোপেজ ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে একসঙ্গে কিছুকাল স্পেনিস মরক্কোতে ছিলো, সুতরাং সে তাকে বেশ ভাল রকমই চিনতো ; কিন্তু লোপেজ তার স্বরূপ জানতো না। মনে মনে ভাবলো, হয়তো কোন গুরুতর রাজকার্য্যেই তাকে ডেকে পাঠান হোয়েছে। সেভিলে গিয়ে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে, লোপেজের সৈন্য সঙ্গীদের নায়ক সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অফিসে ঢুকে গেল। লোপেজ একটু অবাক্ হোল, কারণ ইদানীং একরকম অভ্যর্থনায় সে অভ্যস্ত ছিল না ; কারণ যেখানে "মাননীয় ডন্ লোপেজ" উপস্থিত হোত সেখানেই একটা সাড়া পড়ে যেত, সাদর অভ্যর্থনা হোত।

সেখান থেকে তারা একটা বন্ধ মোটর গাড়ীতে রওনা হোল। সঙ্গীরা যখন বোললো নামুন, মোটরের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লোপেজ অল্প একটু শিউরে উঠলো, এ-যে সেভিলের সেই সুবিখ্যাত জেলখানা ! ভেতর থেকে জেলের দারোগা বেড়িয়ে এলেন—"অনারেবল ডন্ লোপেজ, কয়েক দিনের জন্য আপনি আমার অতিথি।"

"কেন ? অপরাধ ?"

"জানি না, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর আদেশ"

"আমি জেনারেলের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

কিন্তু তার এ কথার কেউ জবাব দিল না, তার কুঠরীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। বিচারের ফলাফলের জন্য লোপেজ একটুও চিন্তিত ছিল না। কারাবাসও তার পক্ষে নতুন নয়। গণতন্ত্রী সরকারের অধীনে আবার তার কিসের বিচার? অপরাধই বা কি, কা'রাই বা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে? এসব জানবার জন্যই তার একটা প্রবল কৌতুহল জাগছিলো।

পরদিন অপরাহ্নে লোপেজ বিচারালয়ে নীত হোল। অতি সংক্ষিপ্ত বিচার। প্রথম তাকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা পড়ে শোনান হোল। "মাননীয় ডন্ লোপেজ, আপনি আপনার উন্মার্গগামী মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা দ্বারা দেশ ও দেশবাসীর ক্ষতি সাধন করবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।" লোপেজের তখনও এইটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ছিলো যে, এখানে এসব অভিযোগের প্রতিবাদ কোরতে যাওয়া মানে, এইসব হৃদয়হীন নর-পশুর উপহাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ দণ্ড তো আগেই ঠিক হোয়ে আছে, বিচারটা প্রহসন মাত্র!

লোপেজের বহু পূর্ব্বের পরিচিত দু'জন শ্রমিক সাক্ষ্য দিল। তারা বললো, লোপেজ তাদের কাছে পুঁজিবাদ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে ধনিক ও ধর্ম্মযাজকদের হত্যা কোরবার প্ররোচনা দিত।

তারপর এলো ক্যাম্পোজ। এবার এই প্রহসনটা লোপেজের কাছে একেবারে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হোয়ে গেল। ক্যাম্পোজ যা বোললো, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই: লোপেজের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়, তার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে তার জন্য সে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত। কিন্তু একথা সে হলপ কোরে বোলতে পারে, তার এই সুদীর্ঘ জীবনে লোপেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধি এবং জনগণের অহিত সাধন ছাড়া আর কিছুর জন্য চেষ্টা করেনি। ক্যাম্পোজের মতে অত্যন্ত

দুঃখের বিষয় হোলেও স্পেনের হিতার্থে লোপেজকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই উচিত।

তারপর এলো ম্যারিয়া। লোপেজ বোধ হয় সেই মুহূর্তে তাকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখবে বলে আশা কোরছিলো। মিষ্টি জিনিষ খারাপ হোয়ে গেলে যেমন অনেক তেতো জিনিষের চেয়েও অতিমাত্রায় বিস্বাদ হোয়ে দাঁড়ায়, লোপেজের প্রতি ম্যারিয়ার প্রেমও তেমনি এমন বিজাতীয় ঘৃণায় পরিণত হোয়েছিল, যার তুলনাও হয় না। ম্যারিয়া বললো, লোপেজ যে একজন প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক এবং দুঃপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোক তা সে তার ছেলেবেলা থেকেই জানে।

রায়দানকারী জজ্‌ও ক্যাম্পোজের সঙ্গে আশ্চর্য্যরকম ভাবে একমত হোয়ে ঠিক কোরলেন যে, লোপেজকে বাঁচতে দেওয়া দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত অমঙ্গলজনক হবে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন-কারাকক্ষে বসে লোপেজ তার জীবন-ইতিহাসের পাতাগুলি একটী একটী কোরে উল্টে যাচ্ছিলো। ম্যারিয়াকে সে হারিয়েছিলো সে কথা সত্যি; কিন্তু তার স্মৃতি সে একদিনের জন্যও সম্পূর্ণ ভাবে ভুলতে পারেনি। ম্যারিয়ার একখানা ফটো এবং তার কয়েকখানা বাছা চিঠি এই সুদীর্ঘ সময়ের কোন অবস্থাতেই সে তার কাছছাড়া করেনি। ম্যারিয়ার কথার প্রতিবাদ স্বরূপে আজকে এগুলিকে সে জগতের সমক্ষে হাজির কোরতে পারতো, কিন্তু প্রথম কথা, এ-তো প্রহসন! সত্যিকারের বিচার তো আর নয়, তাছাড়া এই দয়া-মায়া, বিচারহীন পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার আর মোহ কি? বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য লোপেজ যদি মরেই পৃথিবীরই বা এমন কি ক্ষতি হবে! যে চক্রান্তের জালে পড়ে লোপেজ ম্যারিয়াকে হারিয়েছিলো, অবসান ঘটেছিলো তার জীবনের রঙ্গীন

মধু-মাসের, স্পেনীয় রাষ্ট্রজগতে শ্রমিক-কৃষকের ভাগ্যাকাশে যে মধু-মাস জেগেছে, লোপেজের মৃত্যুর পর একই কৌশলে এবং একই হস্তে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, লোপেজ তা বুঝতে পারছিলো। কখন মৃত্যু এসে তার দুঃখময় জীবনের ওপর শান্তি-হস্ত বুলিয়ে দেবে তারই অধীর প্রতিক্ষায় সে অপেক্ষা কোরছিল ; কিন্তু এই জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই যদি সে আরেকবার প্রথম থেকে জীবন আরম্ভ কোরতো ; অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যুদ্ধ কোরতে, একজন অবোধ পল্লী-বালার অবৈতনিক অভিভাবক হ'তে, অথবা গরীবের জন্য জীবনপণ কোরে যুদ্ধ করতে পৃথিবীর এই ঘোর অবিচার স্মরণ কোরেও সে কোনদিন পিছ পা' হোত না : কারণ লোপেজ তার জীবনে যা কিছু কোরেছিলো ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে করেনি, কর্ত্তব্য বোধেই কোরেছিলো।

সেইদিন গভীর রাত্রে লোপেজকে হত্যা কোরবার জন্য যখন বাইরে এনে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল ; আকাশে তখন আলো ছিল না। কিন্তু লোপেজ ভাবছিলো তখন সেই একদিনের কথা, যেদিন লোপেজের বয়স ছিল চব্বিশ, ম্যারিয়ার বয়স বাইশ আর আকাশ ছিলো আলোয়-আলোময়, যেদিন লোপেজের কাঁধে একান্ত নির্ভর-ভাবে মাথা রেখে ম্যারিয়া তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো—"তোমার চেয়েও আর কেউ কোনদিন আমার বেশী আপন হোতে পারে—একথা কি তুমি বিশ্বাস করো !"

শতাব্দীর স্বপ্ন

কানপুর ষ্টেশনে নেমে বেশীদূর এগোতে আর সাহস হয় না। সমস্ত দিনের চেষ্টায় ঠিক রেল-লাইনের ধারেই ছোট্ট একখানা খোলার ঘর ভাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গের বিছানা-বাক্স, আর বাজার থেকে সদ্য-কেনা ভাত রাঁধবার ছোট্ট একটা হাঁড়ি, এই নিয়েই নরেশ তার পলাতক জীবনের ঘর-সংসারী আরম্ভ করে দেয়।

নরেশের আগমনের কথা সেই রাত্রে অনেকেই জানতে পারেনি। সকালে রাস্তার কলে জল আনতে গিয়ে অনেকগুলি কৌতুহলী নর-নারীর চক্ষের সামনে সে সঙ্কুচিত বোধ করে, অল্প ভীতও হয়। না, দুঃখ ভারগ্রস্ত কর্ম্ম-ক্লান্ত নরনারী এরা, অহেতুক পরের অনিষ্ট করতে বেশী উৎসুক বলে মনে হয় না। নরেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু তবুও সে সহজে নিজকে পারিপার্শিক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। কি অসহ্য নোংরামী চারদিকে; যত সব বিশ্রী গালাগালিকে এরা সব কথাবার্ত্তার মধ্যে অলঙ্কার হিসেবেই যেন ব্যবহার করে, বস্তি-এলাকার যতদূর দেখা যায় সরু রাস্তাগুলির দুপাশে আবর্জ্জনার স্তুপগুলি সমস্ত দিন ধরে আস্তে আস্তে পচতে থাকে, নর্দ্দমা নামধারী কাদার রেখাগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের পায়খানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সব পুতিগন্ধময় স্থানে জন্মপ্রাপ্ত পশ্চিমের বিখ্যাত মাছিগুলি যখন সমস্ত আবিলতা বয়ে নিয়ে গিয়ে একযোগে নরেশকে আক্রমণ করে সমস্ত মনপ্রাণ তার বিদ্রোহ করে, একটা দুর্দ্দান্ত ইচ্ছে হয় এখান থেকে একেবারে ছুটে পালিয়ে যাবার। কিন্তু অনেক কথা ভেবে সে আবার নিজের মনকে শান্ত কোরে আনে। চিন্তাগুলিকে অন্তর্মুখী কোরে নিজকে ভুলিয়ে রেখে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সে উর্দ্ধে উঠে যেতে চায়।

ঘরের একমাত্র দরজাটাকে সে যথাসম্ভব বন্ধ রেখে সঙ্গের বইগুলিকে বার বার পড়ে প্রায় মুখস্ত কোরে ফেলে।

এই নতুন মানুষটীর সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের কৌতুহল অবশ্য সহজে প্রশমিত হয় না। ছিন্ন পোষাক আর কালো চেহারা হলেও, নরেশ যে তাদের মতই মজুর নয় একথা তারা বুঝতে পারে। কি করে যেন কথাটা রাষ্ট হয়ে যায় যে সে লেখা-পড়া জানে, বড় বড় বই পড়ে। কি অবস্থার মধ্যে তারা বাস করে তারাও যেন অল্প বোঝে, নরেশের জন্য তারা দুঃখিত হয়, যথাসাধ্য সহানুভূতিও দেখায়।

দরজা-কবাট কিন্তু বেশী দিন সে বন্ধ রাখতে পারে না। একদিন সকালবেলা দুঃসাহসী এক গোয়ালা একেবারে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে, বাবু লেখাপড়া জানেন, একটু মেহেরবাণী কোরে ছোট্ট কয়েকটা দুধের বিল লিখে দিতে হবে। পরিবর্ত্তে সে মাঝে মাঝে একপো কোরে দুধ দিয়ে যায়, নরেশও তা বিনা সঙ্কোচেই গ্রহণ করে। এই গোয়ালার মারফৎ আরো দুটো মূল্যবান জিনিষ পাওয়া যায়,—বস্তির বাইরেকার সহরের উল্লেখ-যোগ্য সকল খবর, আর একখানা বাংলা খবরের কাগজ।

এই গোয়ালাই প্রথম আগন্তুক।

তারপর সাহস পেয়ে আরো অনেকে আসতে থাকে। অনেক দূর থেকেও কেউ কেউ আসে। কাউকে হয়ত তার দূরদেশী আত্মীয়ের কাছে লেখা চিঠির ওপরে ইংরাজী ঠিকানা লিখে দিতে হবে। কেউ হয়ত তার মিলের ম্যানেজারের কাছে দরখাস্ত দেবে তাই তাকে তৈরী কোরে দাও। নরেশ বিরক্ত হয়না নিশ্চিত বুঝে তাদের সাহস আরও বেড়ে যায়। শেষে এগুলিই তার সকালে বিকেলে একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল।

তারপর ঘটলো একটা অত্যন্তরকম অভাবনীয় ঘটনা। কানপুর সহরের একটা অংশ কাপড়ের মিল আর চামড়ার কলে ভর্ত্তি, নরেশ তার মক্কেলদের মারফৎ খবর পেল যে একটা চামড়ার কলে তিরিশ টাকা বেতনের একটী সহকারী রাসায়নিকের কাজ খালি হয়েছে। কোন কিছু আশা না কোরে সে একটা দরখাস্ত দিল। সে বি, এস্‌সি, কিন্তু পার্শী ম্যানেজারের যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় তার জন্য সে বললো যে লেখাপড়া সে বেশীদূর জানেনা ; তবে হাতে কাজ দিলে খুব ভাল ভাবেই সে পারবে। ম্যানেজার তাকে প্রধান রাসায়নিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নরেশ তাকে খোসামুদি কোরে যেটুকু-না-জানতো শিখে নিয়ে চাকরী স্থরু কোরে দেয়।

বস্তিতে বাস কোরে তিরিশ টাকা তার কাছে অনেক টাকা। নিজের শ্রমের উপার্জ্জিত টাকার যে আলাদা একটা মাধুর্য্য আছে তা সে এই প্রথম জানলো। ভাল কোন জায়গায় বাসা বদলাতে সাহসে কুলায় না, উদ্বৃত্ত অর্থের সবটুকু দিয়েই সে কেবল বই কিনতে থাকে। ইচ্ছে, অনিশ্চিত মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় জীবনের যে-কটা দিন কাটে সে-কটা দিনকে শতমুখী জ্ঞানের সম্ভারে সমৃদ্ধ কোরে তুলবে।

দিনগুলি এখন বেশ ভালই কাটে। রাতের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। নরেশের চিরকালই কেমন জানি বদ-অভ্যেস, শেষ রাত্রের কাছাকাছি কোন সময়ে রোজই তার একবার করে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘরে জানলা ইত্যাদির বালাই নেই, শুধু একটা মাত্র দরজার মারফৎই বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক। আগে সে ভাবতো এটা তার বাড়ীওলার নির্ব্বুদ্ধিতা, এখন কিন্তু উল্টো সে তার বুদ্ধির তারিফ করতে প্রস্তুত, যেদিকে দরজা তাছাড়া অপর তিনদিকের দেওয়ালের অপর পারে আলাদা আলাদা ঘর এবং এক একটা ঘরে এক একটা পরিবার বাস করে। এতে বাড়ীও'লা

প্রভুর দেওয়ালের খরচ বেঁচেছে, ভাড়া বেশী আদায় হচ্ছে, আবার ভাড়াটেদেরকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, জানলা কোরলে আলো ত আসবেই না, মধ্যের থেকে আর একটা পরিবার বে-আব্রু হবে। রাত্রে নরেশ একটী মাত্র দরজাকেই খুলে রাখে ভাল কোরে দম ফেলবার জন্য। কোন রাত্রে হয়ত সে ঘুম ভেঙ্গে দেখলো, পশ্চিমের চাঁদ বড় ওই আম গাছটার অপর পারে হেলে পড়েছে, সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে আসছে ঝিকিমিকি সোনালী আলো। সেই আলোর মায়া পরশে তার সুদূরের স্মৃতির গোপন ভাণ্ডার সহসা উন্মুক্ত হয়ে যায়। অতি সন্তর্পণে সেই ভাণ্ডার থেকে নরেশ বেছে বেছে বার করে কয়েকটী হাসি আর আনন্দ মণির টুকরো। তারপর সেইগুলিকে নিয়ে খেলা চলে, মনের এপাশ থেকে ওপাশে বার বার গড়িয়ে, যতক্ষণ না আবার সে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে আবার সে-গুলিরই স্বপ্ন দেখে। আবার হয়ত কোন বর্ষণ-মুখর রাত্রে দমকা হাওয়ায় বয়ে আনা জল-কণার স্পর্শে শেষরাত্রের অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরের ওই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি-ধ্বনির সঙ্গে মানব মনের নিভৃত কোণে লুকোনো পুরোণো ব্যথার যেন একটা অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে। অনেক দিনের আরাম হওয়া ক্ষতগুলি আবার নতুন কোরে জাগ্রত হয়। কবে সেই কোন অতীতে চির-দুখিনী তার মা নরেশের অমঙ্গল আশঙ্কা কোরে কিরকম উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল-ক্ষেপ কোরতেন; কোন সব বন্ধুরা আন্তরিক ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল এ পথ ঠিক নয়; কার কোমল দুটী বাহু তাকে সাধারণ জীবন যাত্রার পথে চালিত করতে চেয়েছিল, এ সবের ভালমন্দ বিচার করার সময় অবশ্য আজ নয়। তবু সেই একটী অশ্রু ভারাক্রান্ত মুখ অন্ধকারের প্রচ্ছদপটে উদিত হয়ে মনকে উতলা করে তোলে, পিছু টানে। এই সব কথা ভাবে

আর দড়ির খাটিয়ার ওপর এপাশ ওপাশ করে, কিন্তু ভোর হবার আগে আর শান্তি পায় না।

এমনি একটা বেদনা-বিধুর প্রহরে নরেশ একদিন শুনতে পেল বালক-কণ্ঠে কে যেন অতি নিকটেই কোন একটা উন্মুক্ত জায়গায় গড়াগড়ি দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্না যদি কোন ঘরের ভেতর থেকে আসতো নরেশ তাতে মোটেই উদ্বিগ্ন হোত না। এ ক্ষেত্রে তার মনে হল যে ক্রন্দন-কারীর নিকটে শ্বান্তনা দেবার কেউ নেই। নরেশ তাই ক্রন্দন ধ্বনি লক্ষ্য কোরে অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজতে থাকে। অবশ্য বেশী খুঁজতে হয় না, সরু গলিটা এক লাফে পার হয়ে দু-একটা বারান্দার পরেই আবিষ্কার করে সে মঙ্গলুকে। টিকি সম্বলিত নেড়া-মাথা একরত্তি সেই ছেলেটা। নরেশ তার গায়ে হাত দিয়ে ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করে.—"কিরে তোর জ্বর হয়েছে নাকি, বারান্দায় পড়ে কাঁদছিস কেন?"

সহানুভূতির স্পর্শে মঙ্গলু আরও কাঁদতে থাকে, দুঃখের কারণ তার অনেকগুলি, সন্ধ্যে থেকে তার বাপ সোহন কোথায় যেন মাঝে মাঝে চলে যায়, সেদিনও গেছে। একা ঘরে তার বড় ভয় করে, ঘুমুতে পারে না। "বোখার" অল্প তার রোজই হয়, তবে আপাততঃ তার "রোটী" খাবার "ভুখের" জন্যই সে কাঁদছে।

মুহূর্তে আর সকল কথা তার মন থেকে অনেক দূরে অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যায়, ত্বরিত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, "জ্বরের মধ্যে রুটী খাবি কিরে, দাঁড়া আমি অন্য কিছু একটা বন্দবস্ত কোরছি।"

প্রথমে সে একবার আশে-পাশের সব রুদ্ধ দরজাগুলির দিকে তাকায়, তারপর সেই গভীর নিশীথেই সে কর্ম্ম-চঞ্চল হোয়ে পড়ে। সব চেয়ে আগের কাজ হয় তার মঙ্গলুকে কোলে নিয়ে গিয়ে মোটা

একখানা চাদর গায়ে দিয়ে নিজের খাটিয়ায় শোয়ান। তারপর মোড়ের পরিশ্রান্ত দোকানীটাকে অনেক ধাক্কা-ধাক্কী করে জাগিয়ে কিছু বার্লি কিনে নিয়ে আসে। খবরের কাগজ গরম কোরে সেই বার্লি তৈরী কোরে খাওয়ালে মঙ্গলু ঘুমিয়ে পড়ে। নরেশও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয় একখানা পুরোণো গায়ের কম্বল মাটিতে বিছিয়ে।

পরদিন সকাল-বেলা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে নরেশের দরজায় এসে সোহন স্তব্ধ হোয়ে যায়। নরেশ সামনেই বসেছিল, চোখে কিন্তু তার ক্রোধ কিংবা ভর্ৎসনার কোন চিহ্নই ছিল না, ছিল শুধু গভীর বিস্ময়, হয়ত ভাবছিলো মানুষ এতটা হৃদয়হীন হতে পারে কিসের অভাবে! তবু সোহন যখন একান্ত অপরাধীর মত নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য মঙ্গলুকে কোলে তুলে নিল, একটু কঠিন স্বরেই সে সোহনকে স্মরণ করিয়ে দিল, "সোহন, মঙ্গলুর জ্বর হোয়েছে, বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার।"

সোহনের হাবভাব দেখে নরেশ মনে কোরেছিল, এ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু যেন তার অনুপস্থিতিতে ছেলেকে আর কেউ দেখবে বুঝে সোহনের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বেড়ে গেল। প্রায়ই এমন ঘটতে লাগল যে ভয়ার্ত্ত বালককে তার নিজের ঘরে নিয়ে আসতে হয়। নরেশ চিন্তিত হয়, বোঝে এসম্বন্ধে স্থায়ী-ভাবে একটা কিছু করতে পারলে ভাল হোতো। কিন্তু পথ যে কি তাও জানা নেই।

মঙ্গলু আর সোহনের চিন্তায় আরও অনেক প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ভীড় করতে থাকে। মাস মাইনে পেয়ে এবার সে কতকগুলি নতুন ধরনের বই কিনে আনে। মঙ্গলু যখন তার খাটীয়াটার ওপরে ঘুমোয়, নরেশ তখন ছোট লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে

কার্ল মার্কস বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে, আর ওঠে সেই বেলা সাতটার সময়, শেষ রাত্রের স্মৃতির স্বপ্নগুলি আর দেখে না।

শেষ রাত্রের স্বপ্ন আর দেখে না, কিন্তু স্বপ্ন সে দেখে আজকাল দিন-রাতই। স্মৃতির স্বপ্ন যদিবা এখন সে দেখে না, দেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দেখে ছোট ছোট গলি-গুলির জায়গায় হয়েছে পিচ ফেলা বড় বড় রাস্তা। আর বস্তির মেটে ঘর-গুলি ভেঙ্গে সেখানে উঠেছে সুন্দর সুন্দর ব্যারাক, তা আবার অসংখ্য ইলেক্‌ট্রিক আলোয় ঝলমল কোরছে। আর তার অধিবাসীগুলি! তাদের কথা ভাবতেই নরেশের সব চেয়ে আনন্দ হয়, তাদের স্কন্ধ থেকে সকল পরাধীনতা আর নোংরামীর বোঝা নেমে গিয়ে তারা হাল্কা স্বাধীন মানুষ হোয়েছে, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ কোরে সত্যিকারের বাঁচা বাঁচতে শিখেছে। তার আর কারুর জন্যই চিন্তা করতে হয় না, এমন কি মঙ্গলুর জন্যও না।

নরেশ জানে এ স্বপ্ন তার নতুন নয়, রুশো ভলটেয়ার আর কার্ল মার্কসের যুগ থেকে এই পরিপূর্ণ এক শতাব্দি ধরে তার মত লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে এই স্বপ্ন। এ স্বপ্ন আবার কোথায় কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এ সবের খোঁজ নেয় আর সে আনন্দে মেতে ওঠে। নরেশের মুখে চোখে দেখা দেয় আবার সেই পুরোণো আগুণের আভা। এক বস্তি থেকে আরেক বস্তি এক মিল এলাকা থেকে আরেক মিল এলাকায় সে উদ্বুদ্ধ পাগলের মত ছুটোছুটী করে। এখন আর চারদিকের কোন কিছু তার মোটেও নোংরা মনে হয় না, মনে হয় চারিদিকে ছড়ান রয়েছে কেবল বারুদের স্তূপ—সন্তর্পণে পদক্ষেপ না করলে যে কোন মুহূর্ত্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে। নরেশ সন্তর্পণে পদক্ষেপ করে।

নরেশ রাত্রে যা পড়ে, দিনে সেই গুলিই চিন্তা কোরে বিশ্লেষণ করে, আর কার্য্যে পরিণত কোরতে চেষ্টা করে। অনেকটা তার কলেজের দিনের বিজ্ঞান ক্লাশের পর "প্রাকটিক্যাল" করার মতো। এদিকে রোজ সকাল বেলাকার দুধের হিসেব কসা, চিঠির ঠিকানা লেখা, দরখাস্ত লিখে দেয়া এসব ত আছেই। আরেকটা তার মস্ত কাজ নতুন হয়েছে। সকাল বেলা ঘণ্টা খানেকের জন্য রীতিমত একটা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করতে হয়। কে কার কাছে টাকা নিয়ে ধার শোধ দিচ্ছে না, মাতাল হয়ে কে কাকে মার ধোর করলো, বিচার্য্য বিষয় এরকম ধরণেরই বেশী। হাস্যকর দাম্পত্য কলহের দু একটা অভিযোগও যে তার শুনতে না হয় তা নয়, সেও যদিবা অল্প হেসে দু একটা মামলা সরাসরি ডিস্‌মিস্ করে দেয়, অভিযোগকারিণীদের কাছ থেকে অবশ্যম্ভাবীভাবে অনুযোগ শুনতে হয়, পুরুষ মানুষ কিনা তাই পুরুষ মানুষের দিকে টানবেই ত সে!

আরও ঘনিষ্টতা হওয়াতে মঙ্গলুর সম্বন্ধেও দু একটা নতুন তথ্য সে জানতে পারে। মঙ্গলবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর মা ওর নাম রেখেছিল মঙ্গলু। সোহন নাকি চিরদিনই অমন খারাপ ছিল না, আগে নাকি সে মঙ্গলুকে ভালও বাসতো খুব। একবার নাকি সে ওকে একটা পাঠশালাতেও ভর্ত্তি করে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য, পরে সোহনের চাকরী চলে যাওয়াতে আর মাইনে চালাতে পারেনি। নরেশ বসে বসে বই পড়ে, আর মঙ্গলু আপন মনে গল্প বলে যায়। স্কুলে পড়ার কথা শুনে, নরেশের মাথায় একটা খেয়াল আসে,

"পড়া-শুনো করতে তোর ভাল লাগে মঙ্গলু?"

মঙ্গলু নরেশের মোটা মোটা বইগুলির গায়ে একটু স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে টিকি শুদ্ধ মাথাটা অনেকখানি কাত কোরে বলে, "হুঁ"—

"দাঁড়া, আমি তোকে আবার পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেব।"

কিন্তু পাঠশালার নাম শুনেই মঙ্গলুর মুখ শুকিয়ে যায়, "হুঁয়াপর বহুত মারতা হ্যায় হুজুর।"

অগত্যা তার কর্ম্মব্যস্ত দিনের মধ্যে আরেকটু সময় বের করে নিতে হয় মঙ্গলুকে পড়াবার জন্য।

মঙ্গলু আবার আরেকটা খবর দেয় একদিন "জানেন বাবুজী আমার মঙ্গলু ছাড়াও আরেকটা নাম আছে।"

"কি নাম ?"

মঙ্গলু তার ছোট্ট বুকের ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয় "দুঃখীয়া"।

রকম দেখে নরেশ একটু আমোদই অনুভব করে, একটু রহস্য করে আবার জিজ্ঞেস করে, "দুঃখীয়া কেন রে ?"

"জানেন না 'বাবুজী' আমার যে নসীব !"

কপালে হাত দিয়ে এমন ভঙ্গীতে মঙ্গলু এই "নসীব" কথাটা উচ্চারণ করে যে নরেশ ভয়ানক হাসতে থাকে। এতটুকু মাতৃহারা ছেলেটা নিজের দুঃখের বরাতটা যে এমন ভাবে বুঝতে পেরেছে তা মনে করে অনুকম্পাও হয়। তাই হাসতে হাসতে নরেশের চক্ষু আবার সজল হয়ে ওঠে, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে মঙ্গলুকে আরও কাছে টেনে এনে বসায়।

সোহনের জন্যও নরেশের কম খাটতে হয় না। সোহনকে সে এখন বুঝতে পারে। তাকেও সে ডেকে এনে মাঝে মাঝে মঙ্গলুর মত কাছে বসিয়ে তার জীবনের জানবার মত প্রায় সব কথাই জেনে নিয়েছিল। নরেশ সব কিছুই যেন আজকাল বিশ্লেষণ কোরতে আরম্ভ করেছে। সোহনের অনেক কাল যাবৎ কোন চাকরী বাকরী নেই।

বসে থাকতে থাকতে মনটা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। মঙ্গলুর মা মরে গেলে সোহন ওর নাম রাখে দুঃখীয়া। সোহন আবার বিয়ে করেছিল কিন্তু সংমা মঙ্গলুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করায় সোহন তাকে কিছুদিন হোল মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবসাদগ্রস্ত জীবন সোহনের একটুও ভাল লাগেনা তাই তাকে মদ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কু-অভ্যাসের মধ্যে উত্তেজনা খুঁজতে হয়।

এসব কথা নরেশ কাণ পেতে শোনে, সঙ্গে সঙ্গে সোহনকে উদ্ধার কোরবার ভাল একটা উপায় তার মাথায় আসে। সন্ধ্যে হলেই নরেশ সোহনকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসে। কোন সময় তার কাছে হয়ত বা দু একটা পৌরাণিক গল্পই বললো কোন সময় বা তার বিস্ফারিত চক্ষুর সামনে, বৃহত্তর জগতের চমকপ্রদ রহস্যগুলিকে উদ্ঘাটিত করে। কখন তাকে সঙ্গে নিয়ে গল্প করতে করতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতে বের হয়। সোহন টেরও পায় না, কেমন কোরে যেন আস্তে আস্তে নরেশের কাজের উন্মাদনা সোহনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। সোহন যখন মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রণদিত হয়েই কাজের ভার চায়, নরেশের মন সাফল্যের আনন্দে ভরে ওঠে।

আর শুধু মঙ্গলু আর সোহন বলেই নয়, মাত্র এই ছয় মাসের মধ্যে কানপুরের সমস্ত বস্তি-অঞ্চলের প্রত্যেকটী বাসিন্দার মধ্যে এমন সুস্পষ্ট একটা পরিবর্ত্তন এসেছিল যে তা নেহাৎ বাইরের লোকের চোখও এড়াত না। সহস্র বৎসরের মৌন ব্যথা এক অজানিত মুক্তির আশায় আস্তে আস্তে মুখরতা লাভ করে, লক্ষ লক্ষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত মে-দণ্ড যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে তড়িৎ চেতনা লাভ কোরে খাড়া হয়ে ওঠে।

নরেশ প্রথম মনে করেছিল কোন প্রকাশ্য কাজে সে থাকবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ সে তা পারলো না। চিরদিনই সে কর্ম্মের দায়িত্ব

আর উত্তেজনায় সামনের অতি অবশ্যম্ভাবী বিপদকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোরেছে, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। সে ভুলে গেল যে সে একজন ফেরারী আসামী। প্রত্যেক নগর-শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করে নরেশ। প্রত্যেক ষ্ট্রাইকের উৎসাহী কর্ম্মীবৃন্দের নামের তালিকার মধ্যে নরেশের নামই আগে পাওয়া যায়। কানপুর সহরের অন্যান্য সমধর্ম্মী-দের সঙ্গে সে অবাধে আলাপ আলোচনা ও মেলামেশা করে। নরেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিক চিহ্নিত রক্তপতাকাগুলির মতোই।

কিন্তু মানুষ বিপদকে ভুললেও বিপদ মানুষকে ভুলে থাকে না। নরেশের অসাবধানতার ফলও একদিন ফললো।

বাস্তবিক পক্ষে এতটা শারীরিক কষ্ট সহ্য করতেও কোনদিনই সে অভ্যস্ত নয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী আর অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান আস্তে আস্তে তার দেহের ওপর প্রতিক্রিয়া সুরু করে দিয়েছিল অনেক দিন যাবতই। নেহাৎ মনের জোরেই এতদিন সে চলাফেরা কোরতে পেরেছে। সম্প্রতি ছদিন যাবৎ অল্প অল্প জ্বর হওয়াতে সেদিন সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোহনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল,

"পুলিশ আয়া বাবুজী, আপকোই ঢুঁড়তা"

সোহন তেমন ভয় পেয়েছে বলে মনে হলনা। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত পাড়াটাই ভারী বুটের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে। রাত তখন প্রায় ছটো। নরেশ সোহনকে বললো—"উ লোককো আনে দেও, তোম যাও মঙ্গলুকো পাস।" নরেশ বিছানা থেকে উঠলো না। কিন্তু কিছুক্ষন পড়েই পুলিশরাই আবার তার ঘরে সোহনকে ধরে নিয়ে এল খানাতল্লাসীর সাক্ষী হিসেবে।

সকাল বেলা চারদিকে লোকে লোকারণ্য। রাত্রে ভারী বুটের শব্দ আরো অনেকেই শুনেছিল, কিন্তু পুলিশ দেখে সকলেই বুদ্ধিমানের

মত আবার চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়েছে। এদিকে কেমন কোরে জানি কথাটা সমস্ত পাড়াময় রাষ্ট হয়ে গেছে যে নরেশ একজন খুনী আসামী। বাংলা থেকে পালিয়ে এতদিন যাবৎ কাণপুরে এসে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সকলে তার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে, যেন কোন দেব-মূর্ত্তীর চাকচিক্যের অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ খানিকটা খড় বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু খুনী আসামী শুনেও কেউ তাকে তেমন ঘৃণা করতে পারলো না, কারণ মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি ঠিক দেব-মূর্ত্তির ভেতরকার খড়ের মতোই কি কি অবস্থা বিশেষে বেরিয়ে পড়ে অতর্কিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে দারিদ্র্য বিষে বিষাক্ত মন অন্ধকারের এই মানুষ গুলির কাছে তা একেবারে অজানা নয়; তাদের মুখের ভাব শুধু এই, "বাবুজী, তোমার কাছে ঠিক আমরা এমনটী আশা করিনি!"

যাকে নিয়ে এত, তার কিন্তু এসব বিষয়ে মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে বলবে সে মৃত্যু পথের যাত্রী? ঘরে খানাতল্লাসী হচ্ছে, বাইরে সে খাটীয়াটা রাস্তার ওপর পেতে বসে আপন মনে পা দোলানতে ব্যস্ত। মুখের ভাব দেখলে মনে হবে সে যেন শুধু একটা খুব মজার ধরণের লুকোচুরী খেলা খেলতে খেলতে অবশ্যম্ভাবীভাবে ধরা পড়ে গেছে, তার বেশী আর কিছু হয়নি। সমস্ত রাত ধরে তার বাক্স বিছানার ওপর গবেষণা চলেছে, তোষক বালিশ ইত্যাদি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ধ্বংস করার পর পুলিশের লোকেরা যখন ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেললো তখন নরেশের মোটা ইন্সপেক্টরটী ও রুক্ষ-ভাষী সার্জ্জেন্টিকে একটু ক্ষ্যাপাবার ইচ্ছে হল,

"দিলেন তো মশায়রা সদ্যপোতা আমার সব বোমার বীজগুলি নষ্ট কোরে? আর কয়টা মাস যদি পরে আসতেন, ইন্সপেক্টার সাহেবের রাও-বাহাদুর আর সার্জ্জেণ্ট সাহেবের নাইটহুড কে মারে, এসব অনুর্ব্বর দেশে এমন সুযোগ ত আর বেশী পাওয়া যায় না!"

রাস্তার অভাবে পুলিশের গাড়ী বস্তির ভেতরে ঢুকতে পারেনি, সুতরাং খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে তারপর গাড়ীতে উঠতে হবে। রওনা হবার সময় নরেশ তার জুতো জোড়াটা আর কোথাও খুঁজে পায়নি, রাস্তা কমাবার উদ্দেশ্যে পুলিশের লোকেরা যখন তাকে রেল লাইনের ধার দিয়ে হাঁটীয়ে নিয়ে চললো, ধারাল পাথরকুচিতে পা দুখানা কেটে তার ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো। তবু মুখের হাসিটী তার মিলায়নি।

"ইন্সপেক্টার সাহেব এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন বলুন তো? ভয় নেই মশায় ভয় নেই, খেতাব আপনার ফস্কাবে না, না হয় আমিই আমার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা স্বরূপে আপনার জন্য একটা রাও-বাহাদুর চেয়ে দিয়ে যাবো, তবুও আপনি একটু হাসুন।"

নরেশ ভেবেছিল, তার এই বস্তি আর বস্তির লোকদের কাছ থেকে এমনিই সে হাসতে হাসতে বিদায় নিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যান্ত তা বুঝি আর হয় না।

রাত্রের ঘটনার কথা মঙ্গলু কিছু জানতে পারে নি। সকালে ঘুম ভেঙ্গে সোহনকে না দেখতে পেয়ে সে তার পূর্ব্বেকার অভ্যেস মত এক দৌড়ে নরেশের ঘরে গিয়ে হাজির। নরেশ নাই, ঘরের অবস্থা দেখে ওর আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। চারদিকের জনতা দেখে শুধু বুঝতে পারে যে একটা গুরুতর কিছু হয়েছে। যাকে সামনে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করে "বাবুজী কাঁহা?" কেউ উত্তর দেয় না, শেষে এক বুড়ী নরেশরা যেই রাস্তায় গেছে সেই রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

"বাবুজী···" "বাবুজী···" "বাবুজী···"

নরেশ ফিরে তাকিয়ে দেখে মঙ্গলু একেবারে পড়ি মরি হয়ে ছুটে আসচে, আর একটু এগোলেই ধারাল পাথরগুলির ওপর পড়ে

এক্ষুণি হাত পা কেটে ফেলবে। নরেশ একবার অসহায় ভাবে চারদিকে সোহনকে খোঁজে, কোথাও তাকে দেখতে পায় না।

এতক্ষণের হাস্যোজ্জ্বল মুখে সহসা ভাবান্তর লক্ষিত হয়,

"One minute please,—for the sake of the boy, one minute please."

আর কোন অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ত্বরিতে কয়েকটা লাফ মেরে পাথরকুচি গুলির ওপরে এসে পড়বার আগেই মঙ্গলুকে সে ধরে ফেললো।

হাঁপাতে হাঁপাতে শিশু-সুলভ উৎকণ্ঠার সঙ্গে মঙ্গলু জিজ্ঞেস করে "কাঁহা যাতা বাবুজী ?"

কোত্থেকে সারা রাজ্যের দুর্ব্বলতা এসে নরেশের কাঁধে ভর করে। মঙ্গলুকে আলগা করে উঠিয়ে সে তার বুকের কাছে নিয়ে আদর করে বলে, "যাতা নেহি মঙ্গলু, আয়গা ফিন্। তোম যাও পড়নে বৈঠো"

"আউর কোন পড়া'গা ?"

"হামই পড়ায় গা"

তবুও মঙ্গলু শান্ত হয় না দেখে তাকে মাটীতে নাবিয়ে দিয়ে নরেশ খুব একটা অসন্তোষের ভাণ করে,

"হাম কেয়া ঝুট বাত বোলতা মঙ্গলু ? আয়গা ফিন্।"

নরেশ মিথ্যে কথা বলবে এটা অবশ্য মঙ্গলুর কাছে অসম্ভবই মনে হয়, তা ছাড়া মঙ্গলুকে নরেশ এমন নিবিড় ভাবে আর কোন দিন আদর করে নি ; কিন্তু এদিকে আবার পুলিশ দেখে মঙ্গলুর বড় ভয় করে, নরেশের ঘরের সে যা অবস্থা দেখে এসেছে অতটুকু শিশুর কাছেও বড় আশাপ্রদ মনে হয় না। কোনটা যে ঠিক, অপক্ক বিচার বুদ্ধি নিয়ে মঙ্গলু তা বুঝে উঠতে পারে না।

পিছনে পুলিশ কর্ম্মচারীরা ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। মঙ্গলুকে কাঁকরগুলির ওপারে দাঁড় করিয়ে নরেশ আবার তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ধারাল পাথরকুচিগুলি এবার বড় যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়, কিন্তু মঙ্গলুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোরবার ব্যথাটাই তাকে আরও বেশী দুঃখ দিতে থাকে। অবোধ বালক, সে হয়ত নরেশের আশায় আশায় কতকাল ধরে বৃথাই অপেক্ষা কোরবে। নরেশ তাকে আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত সে জানে সে আসবে না।

শুধু ত মঙ্গলু নয়, মঙ্গলুকে কেন্দ্র কোরে অভিব্যক্ত হয়েছিল যে কর্ম্মজীবন, সেই আরব্ধ প্রচেষ্টাও বোধহয় এমনি করেই তার প্রতীক্ষা কোরবে। কোন নিরালা পুকুরের অকস্মাৎ তোলা ঢেউয়ের মতোই তার সমস্ত কাজের স্মৃতি এই পঙ্কিল আবহাওয়া আর মূঢ় স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে।

কাঁকরের রাস্তাটা প্রায় শেষ হয়ে আসচে, সামনে ঝক্‌ঝকে একখানা মোটর গাড়ী, নরেশ আবার অল্প হাসে,

"আমাকে তাহলে আপনারা সমস্ত রাস্তাটা নেহাৎ বলির পাঠার মতই গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবেন না!"

সার্জ্জেণ্ট ও ইনস্পেক্টার দুজনেই বোধহয় একাজে সম্পূর্ণ নতুন তারা কেবল গম্ভীর থাকে, নরেশের কোন কথার জবাবই দেয় না। নরেশের আবার তার পিছনে ফেলে আসা শতাব্দীর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। সে যার জন্য বিদায় নিচ্ছে সেত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রই, বিগত এই একশ বছরের মধ্যে শুধু এই কাজের জন্যই কেউ গেছে গিলোটীনে কেউ ফাঁসি-কাঠে চড়েছে, আর কেউবা ধনিকের লরীর চাকার তলায় পড়ে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু বস্তী আর নোংরা জায়গার বিশেষ কাজের জন্য লোকের কখনো অভাব হয় নি। একজন যদি গেছে, তার

জায়গা অধিকার করতে আরেকজনের একটুও বিলম্ব হয়নি। নরেশের প্রাণে আবার দুরন্ত আশা জাগে। সে হয়ত চলে যাবে, পথের এই কাঁকরগুলি আর সকল অনুশোচনা অতিক্রম কোরে জীবনের অপর পারে, কিন্তু শতাব্দীর স্বপ্ন যদি সত্য হয়, এই একশত বছর ধরে যদি কর্ম্মীর অভাব না ঘটে থাকে, তার হাত থেকে খসে পড়া রক্তপতাকা চিরদিনই ধূলায় লুটাবে না।

অপেক্ষা করো মঙ্গলু, অপেক্ষা করো!

র‍্যাডিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের তরফ হইতে কমরেড উপেন শর্ম্মা বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও আসাম ফাইন প্রিণ্টার্স,
গৌহাটী হইতে শ্রীপূর্ণ চন্দ্র কাকতীর দ্বারা মুদ্রিত।